উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

চতুর্থ সেমেস্টার

আবশ্যিক পত্র – ৪০২

রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

FOREWORD

The Self Learning Material (SLM) is written with the aim of providing simple and organized study content to all the learners. The SLMs are prepared on the framework of being mutually cohesive, internally consistent and structured as per the university's syllabi. It is a humble attempt to give glimpses of the various approaches and dimensions to the topic of study and to kindle the learner's interest to the subject

We have tried to put together information from various sources into this book that has been written in an engaging style with interesting and relevant examples. It introduces you to the insights of subject concepts and theories and presents them in a way that is easy to understand and comprehend.

We always believe in continuous improvement and would periodically update the content in the very interest of the learners. It may be added that despite enormous efforts and coordination, there is every possibility for some omission or inadequacy in few areas or topics, which would definitely be rectified in future.

We hope you enjoy learning from this book and the experience truly enrich your learning and help you to advance in your career and future endeavours.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় – ক

একক ১ - চোখের বালি : দেশ-কাল প্রেক্ষিত

একক ২ - চোখের বালি : লেখক ও গ্রন্থপরিচয়

একক ৩ - চোখের বালি : সার্বিক বিশ্লেষণ

একক ৪ - চোখের বালি : আঙ্গিক বিচার

একক ৫ - জীবনস্মৃতি : রচনা প্রসঙ্গে নানা কথা

একক ৬ - রবীন্দ্র জীবন পর্বের নানান অভিজ্ঞতার পরিচয়

একক ৭ - জীবনস্মৃতি : অভিনব ভাবনায় জীবনকথা

পর্যায় – খ

একক ৮ - রক্তকরবী : দেশ-কাল প্রেক্ষিত

একক ৯ - রক্তকরবী : লেখক ও গ্রন্থপরিচয়

একক ১০ - রক্তকরবী : সার্বিক পর্যালোচনা

একক ১১ - রক্তকরবী : আঙ্গিক বিচার

একক ১২ - রবীন্দ্র প্রবন্ধ : শকুন্তলা ও রাজসিংহ

একক ১৩ - রবীন্দ্র প্রবন্ধ : কালান্তর ও সভ্যতার সংকট

একক ১৪ - রবীন্দ্র প্রবন্ধ : মানুষের ধর্ম-১ ও অন্তর বাহির

আবশ্যিকপত্র – ৪০২ রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য

একক ৮

রক্তকরবী: দেশ-কাল প্রেক্ষিত- উদ্দেশ্য, সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সমকালীন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডল, সমকালীন পটভূমি ও রবীন্দ্র মানসে তার প্রভাব, মঞ্চ-প্রযোজনা ও রবীন্দ্র ভাবনা।

একক ৯

রক্তকরবী: লেখক ও গ্রন্থপরিচয়- লেখক পরিচিতি, রবীন্দ্রনাথের নাট্য-চর্চা, নামকরণ প্রসঙ্গ, কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, রক্তকরবী প্রসঙ্গে সমালোচকদের অভিমত, রক্তকরবীর ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গ।

একক ১০

রক্তকরবী: সার্বিক পর্যালোচনা- রক্তকরবী নাটকের প্রধান বক্তব্য বিষয়, রক্তকরবী নাটকের সমাজ বাস্তবতা প্রসঙ্গ, রক্তকরবী নাটকে পুঁজিবাদী শোষণের রূপ চিত্র, রক্তকরবী নাটকের কেন্দ্রীয় সংঘাত প্রসঙ্গ, রক্তকরবী নাটকে পুরাণ ভাবনা, রক্তকরবী নাটকের চরিত্র চিত্রণ।

একক ১১

রক্তকরবী: আঙ্গিক বিচার–রক্তকরবীর শ্রেণি বিচার, রক্তকরবীর গঠনরীতি, রক্তকরবীর সংলাপ বিচার, রক্তকরবীতে প্রতীক ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ, রক্তকরবী নাটকে সংগীতের ব্যবহার প্রসঙ্গ।

একক ১২

রবীন্দ্র প্রবন্ধ: শকুন্তলা ও রাজসিংহ- শকুন্তলা: মূল প্রবন্ধ পাঠ, শকুন্তলা প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়, 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের প্রভাব, টেম্পেস্ট ও শকুন্তলার মধ্যে রবীন্দ্রসৃষ্ট

প্রবন্ধে বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য প্রসঙ্গ, শকুন্তলা প্রবন্ধে স্বর্গ চ্যুতি থেকে স্বর্গপ্রাপ্তির বর্ণনা, রাজসিংহ: মূল প্রবন্ধ পাঠ, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের মত।

একক ১৩

রবীন্দ্র প্রবন্ধ: কালান্তর ও সভ্যতার সংকট - কালান্তর প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য, কালান্তর: মূল প্রবন্ধ পাঠ, ভারতে য়ুরোপের অভিঘাত, কালান্তর: নামকরণ প্রসঙ্গ, কালান্তরের শিল্পকৌশল, সভ্যতার সংকট: মূল প্রবন্ধ পাঠ, সভ্যতার সংকট প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবনা।

একক ১৪

রবীন্দ্র প্রবন্ধ: মানুষের ধর্ম-১ ও অন্তর বাহির - 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য, 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয়, মানুষের ধর্ম-১: মূল প্রবন্ধ পাঠ, 'মানুষের ধর্ম-১' প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়, 'মানুষের ধর্ম-১' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা, মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা, অন্তর বাহির: মূল প্রবন্ধ পাঠ।

একক: ৮। রক্তকরবী: দেশ-কাল প্রেক্ষিত

বিন্যাসক্রম

৮.১। উদ্দেশ্য

৮.২। সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

৮.৩। সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

৮.৪। সমকালীন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডল

৮.৫। সমকালীন পটভূমি ও রবীন্দ্র মানসে তার প্রভাব

৮.৬। মঞ্চ-প্রযোজনা ও রবীন্দ্র ভাবনা

৮.৭। অনুশীলনী

৮.৮। গ্রন্থপঞ্জি

৮.১। উদ্দেশ্য

যে কোনো সাহিত্য গড়ে ওঠার পিছনে থাকে লেখকের সমকালীন জীবন যাপনের প্রেরণা। এমনকী যাকে বলা হয় কল্পলোকের কাব্য তার পিছনেও থাকে বাস্তব জীবনের প্রতিক্রিয়া। সুতরাং সমকালীন বাস্তব জীবনের থেকে মুখ ফিরিয়ে কোনো সাহিত্যই সৃষ্টি হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটকগুলিও আসলে সমকালীন বাস্তবেরই এক একটি রূপ। রবীন্দ্রনাথ সমকালীন জীবন থেকেই তার রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। 'রক্তকরবী' নাটকটি সম্পর্কে একথা অনেক বেশি সত্য। সমকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এই নাটকটি গড়ে ওঠার পিছনে কতখানি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, রবীন্দ্রমানসকে তা কতখানি প্রভাবিত করেছিল, তাকে খুঁজে নেওয়াই আমাদের এই এককের প্রধান উদ্দেশ্য।

৮.২। সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

'রক্তকরবী' রচনার সমকালীন জাতীয় ও পর্যায়ে রাজনৈতিক পটভূমিটি ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই সময়পর্বে গোটা বিশ্বজুড়েই রাজনৈতিক পালাবদলের চড়াই-উৎরাই লক্ষ করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপ-আমেরিকা সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও রাজনৈতিকভাবে জড়িত হয়ে গেল ইচ্ছে বা অনিচ্ছে সত্ত্বেও। এই মহাযুদ্ধের ফলে রাশিয়া, জার্মানি, হাঙ্গেরি বা অস্ট্রিয়ার মতো দেশগুলির রাজতন্ত্রের পতন হল। পাশাপাশি গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটলেও মূলধনের বণ্টন ঠিকমতো না হওয়ায় অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে গেল। ফলত, ডেমেক্রাসি বা গণতন্ত্র ব্যাপারটাই পদে পদে প্রতিহত হল।

অবশ্য এই বিশ্বযুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়, লক্ষ্য ছিল পুঁজির বিকাশ ও একনায়কতন্ত্রের প্রসার ঘটানো। ফলত, পশ্চিমি দেশগুলির মধ্যে পুঁজিবাদের ব্যাপক প্রসার বিশ্বরাজনীতিতে ক্ষমতার একমেরুকরণ নিয়ে এল। সৃষ্টি হল মহাশক্তিধর আমেরিকা।

পাশাপাশি বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গেই যন্ত্রশক্তির প্রসার জীবনে নিয়ে এল আর এক সমস্যা। উন্নত দেশগুলিতে আধুনিক শিল্পায়ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে গুরুত্বপর্ণ হয়ে উঠল। কেননা এর ফলে শুধু পুঁজির বিকাশই ঘটল না, দেখা দিল আরও দুটি সমস্যা। এক, উন্নত দেশগুলির মধ্যে সামরিক দিক থেকে অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ে এল এক অশুভ সংকেত যার ভয়াবহ পরিণতি মানুষ প্রত্যক্ষ করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুই, উন্নত কারিগরি বিদ্যা ও যন্ত্রশক্তির সাহায্যে সমাজে শোষণের অভিনব রূপ দেখা দিল। এই শোষণ একই সঙ্গে হয়ে উঠল মানব-বিরোধী ও জীবন-বিনাশী। বেঁচে থাকার জন্য ন্যুনতম অধিকার থেকেও মানুষকে বঞ্চিত করা হল। শিল্পায়নের দ্রুত উন্নতি, পুঁজির প্রসার, প্রযুক্তি ও যন্ত্রের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং সর্বোপরি শোষণের নয়া কৌশল এই বিশ্বকে ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঠেলে দিল। তারই অনিবার্য পরিণাম দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

৮.৩। সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ নাটকটি রচনা শুরু করেছিলেন ১৯২৩-এর এপ্রিল মাস নাগাদ । শেষ করতে দেড় বছরের কাছাকাছি সময় লেগেছিল। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪-এ। কিন্তু যে কাহিনি এবং কাহিনির যে সমস্যাকে তিনি নাটকটিতে রূপায়িত করেছেন, তার সঙ্গে ওই দেড় বছরের সমকালীন আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার প্রত্যক্ষ যোগ নাটকটিতে খুঁজতে যাওয়া বৃথা । কেননা এ নাটক যেমন সমকালীন বাস্তবের কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা সমস্যার প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠেনি, তেমনি এই নাটকের উপস্থাপন-রীতিও সমকালীন বাস্তবকে প্রত্যক্ষ ভাবে তুলে আনার পক্ষে উপযুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের সে উদ্দেশ্যও ছিল না।

বস্তুত, ‘রক্তকরবী’ এমন এক শ্রেণির নাটক যেখানে সমকালীন জীবনের বাস্তবতা প্রত্যক্ষভাবে নেই, অথচ নাটকটি লেখার পিছনে সমকালীন বাস্তবের গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যাই ছিল প্রধান। সমস্যাটি কী তা আলোচনার আগে আমরা দেখে নেব ‘রক্তকরবী’ রচনার সমকালীন আর্থ-সামাজিক পটভূমিটি।

বিশ শতকের প্রথম থেকেই ক্রমশ শিল্পায়নের বিস্তার ঘটতে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবতিত হতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বণিকতন্ত্রের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। সমাজে ক্রমশ অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। এরই মধ্যে ১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বাংলা সহ গোটা বিশ্বের সমাজ ও অর্থনীতিতেই প্রচণ্ড আঘাত নেমে আসে। মধ্যযুগীয় সরল জীবনযাপন ও ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস মানুষকে জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করেছিল, অচিরেই সে মোহ ভঙ্গ হল। মানুষ প্রত্যক্ষ করল ধ্বংসকে। প্রত্যক্ষ করল হিংসা, রূঢ়তা, শোষণ ও অত্যাচারের করাল চেহারা। সমাজে ধন বৈষম্য বাড়তে লাগল। শিল্পের বিকাশের ফলে কৃষক আস্তে আস্তে শ্রমিকে রূপান্তরিত হল। অর্থনৈতিক শোষণ বৃদ্ধির ফলে সব থেকে অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল শ্রমিক শ্রেণির। শোষণ এবং অত্যাচারের লাগামছাড়া গতি শ্রমিকদের মনে অসন্তোষের বারুদ জমিয়েছিল যা ক্রমশ বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছিল। অন্যদিকে একান্নবর্তী পরিবার ক্রমশ ভেঙে যাওয়ার ফলে সমাজে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকৃতি হচ্ছিল। যুদ্ধের প্রবল আঘাত সমাজ ও পারিবারিক

সম্পর্কের ভিতকেই অনেকখানি নাড়িয়ে দিয়েছিলো, যার ফলে সমাজে নারীর ভূমিকা এই সমস্যা থেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল।

৮.৪। সমকালীন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডল

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক এই পটভূমি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক মণ্ডলে নিয়ে এল ব্যাপক পালাবদলের ইঙ্গিত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ইউরোপে শুরু হয়েছিল রিয়ালিস্টিক সাহিত্য আন্দোলন। এই শতকের শেষ দিকে রিয়ালিস্টিক সাহিত্য আন্দোলনই ক্রমে যথাস্থিতবাদ বা ন্যাচারালিজমের রূপ নেয়। কবিতায় এবং বিশষত কথা-সাহিত্যে এর গভীর প্রভাব পড়েছিল। ইউরোপের বালজাক, ফ্লবেয়ার, এমিল জোলা এছাড়া রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয় এবং দস্তয়েভস্কির সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে এই সাহিত্য আন্দোলন ব্যাপক রূপ পায়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ফরাসি কবিতায় শুরু হয় নতুন এক সাহিত্য আন্দোলন। ইউরোপীয় সাহিত্যে একেই বলা হয় প্রতীকবাদ বা Symbolism। পল ভালেরি এবং মালার্মের কবিতায়, মেটারলিঙ্কের নাটকে প্রতীকবাদের লক্ষণীয় প্রভাব দেখা গেল। বিশ শতকের প্রথমে ফ্রয়েভীয় মনস্তত্ববাদ আধুনিক সাহিত্য-শিল্পে গভীর প্রভাব ফেলল। ১৯০৯-এ দেখা দিল চিত্রকল্পবাদী বা ইমেজিস্ট সাহিত্য আন্দোলন। এজরা পাউন্ড এবং টি. এস. এলিয়ট এই সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন। তারও পরে আসে সুররিয়ালিজম বা অধিবাস্তববাদ এবং ডাডাইজম্ বা ডাডাবাদী সাহিত্য আন্দোলন। এই সমস্ত আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন, যা কিছু প্রথাগত, স্থির, সুস্থিত ও সর্বজনস্বীকৃত তাকে ভেঙে ফেলে এক উদ্দাম অবিন্যস্ত লাগামহীন নৈরাজ্যকে তুলে ধরল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে পাশ্চাত্য সাহিত্যে আধুনিকতার যে সূত্রপাত ঘটে তার সব থেকে উল্লেখযোগ্য প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় জেমস্ জয়েসের বৃহৎ উপন্যাস ‘ইউলিসিস’ (১৯২২) এবং টি. এস. এলিয়টের ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’ (১৯২২) কবিতাগ্রন্থকে। বিশ্বসাহিত্যে এই পরিবর্তনের ঢেউ অচিরেই এসে পৌঁছয় বাংলা সাহিত্যে। ১৯০০-তেই রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার পাতায় লিখতে শুরু করেন ‘চোখের বালি’ উপন্যাসটি।

মনস্তত্ত্বধান এই উপন্যাসে ভারতীয় বিধবা নারীর প্যাশনকে নগ্নভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। পাশাপাশি একান্নবর্তী পরিবারের দুর্গে সমষ্টিকে ছাড়িয়ে ব্যক্তির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় 'সবুজ পত্র' পর্বের রবীন্দ্রছোটোগল্পে। ইউরোপীয় সিম্বলিজম্ আন্দোলনকে সাঙ্গীকৃত করেন রবীন্দ্রনাথ নাটকে ও মঞ্চপ্রযোজনায়। বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা এভাবেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে গভীর পরিবর্তনের ছাপ নিয়ে এল। রবীন্দ্রপরবর্তী আধুনিক সাহিত্যিকরা তখন বাংলা সাহিত্যের দরজায় কড়া নাড়ার অপেক্ষায়। ঠিক এমন সন্ধিক্ষণেই সৃষ্ঠি হয়েছে 'রক্তকরবী', যাকে বাংলাভাষার একটি অন্যতম প্রধান সৃষ্টি বললে অত্যুক্তি হবে না।

৮.৫। সমকালীন পটভূমি ও রবীন্দ্র মানসে তার প্রভাব

সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি রবীন্দ্রমানসে যে প্রভাব সৃষ্টি করে, তার প্রতিক্রিয়া ছিল লক্ষ করার মতো। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ শ্যেন-দৃষ্টিতে বিশ্ব রাজনীতিকে দেখছিলেন। ১৯১৬-য় তিনি জাপান-ভ্রমণ করেন। এই সময় থেকেই যন্ত্রসর্বস্ব সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাব বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় ফুটে উঠছিল। ১৯২০-২১-এ ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণের সময় কবি পশ্চিমি উন্নয়নের হাল-হকিকত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর এ সময়ের অভিজ্ঞতা ও তীব্র প্রতিক্রিয়া সমকালীন চিঠিপত্রে, বিভিন্ন বক্তৃতায় ও অজস্র রচনায় ছড়িয়ে আছে। বলা চলে 'মুক্তধারা' (১৯২২) এবং 'রক্তকরবী' (১৯২৬) এই অভিজ্ঞতারই ফসল।

'রক্তকরবী' রচনার আগে 'মুক্তধারা' নাটকে যন্ত্রসভ্যতার প্রতি কবির তীব্র বিরাগ কীভাবে ফুটে উঠেছে, তার দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরা হল-

(ক) পথিক ।। বাবারে ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা । তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে – দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

(খ) রণজিৎ ।। দেখেছ ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন? আর, ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে।

মন্ত্রি ।। আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।

'মুক্তধারা' নাটকে কবি যন্ত্র সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আর 'রক্তকরবী' মূলত পুঁজিবাদী সভ্যতার সর্বগ্রাসী চেহারাকেই তুলে ধরেছে। 'রক্তকরবী' নাটকের যক্ষপুরীর ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে জন্ম নিয়েছিল ১৯২০-২১-এ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের সময় থেকেই। এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার কিছু তথ্য প্রমাণের দিকে চোখ রাখা যাক।

(ক) ১৯২১-এ আমেরিকা থেকে দিনেন্দ্রনাথকে 'Flowing Oil Well, Shreveport, La-II' পিকচার পোস্টকার্ডটি পাঠিয়ে লিখেছিলেন -

"ছবিটা ভালো করে দেখ্ - কেরোসিন তেলের অন্ধকূপ-এর তলায় আছে তেল আর মাথায় উঠচে ধোঁয়া। এখানকার লঙ্কেশ্বরদের এই দশা - এরা নিজের ধোঁয়ার মধ্যে নিজে বিলুপ্ত, সূর্যের আলো এদের মানস চক্ষে পৌছয় না। বলী রাজা পাতালপুরীর রাজা - তার বল হরণ করেছিলেন বামন অবতার। বিষ্ণু ছোট হয়ে বড়কে অভিভূত করেন। সময় এসেচে। যারা এতকাল ছোট হয়ে ছিল, তারাই বড়র ধন হরণ করবার জন্য হাত বাড়িয়েচে - বড় ভয় কম্পান্বিত, চারিদিকে দুর্গপ্রাচীর শক্ত করে গেঁথে তুল্‌চে - কিন্তু দৈত্যভায়ার পাপের ধন আর টিকবে না।"

(খ) ১৩২৮ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে আমেরিকার 'টাইট্যানিক ওয়েলথ্' দেখে কবির পতিক্রিয়া- "লক্ষ্মী হলেন এক; আর কুবের হল আর, - অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই।"

লক্ষণীয়, চারিদিকে দুর্গপ্রাচীর গেঁথে তোলা রাজ্য, সম্পদের বিপুল সঞ্চয় ও কল্যাণহীন সম্পদ এ সমস্ত কথার মধ্যে আমরা 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীর আভাস পেয়ে যাই।

দেখা যায়, এই টুকরো লেখাগুলির মধ্যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যেরূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে 'রক্তকরবী'র ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে।

শুধু এগুলিই নয় যন্ত্রনির্ভর এই পুঁজিবাদী সভ্যতার পরিণতি সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত। মানব-বিরোধী, জীবন- বিরোধী এই শোষণপ্রক্রিয়া এক সময় যে ভেঙে পড়বেই সে সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন তিনি। ১৯২৫-এ লেখা 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন- "বস্তুগত আয়োজনের অসংগত বাহুল্যকেই যে সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলে মানা হয় সে-সভ্যতা অগত্যাই নরভুক। নররক্ত শোষণের বিশ্বব্যাপী চর্চা একদিন আত্মহত্যায় ঠেকবেই, এতে আর সন্দেহ করা চলে না।" বস্তুত, সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি রবীন্দ্রনাথের মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। আর এই প্রতিক্রিয়া থেকেই জন্ম নিয়েছিল 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'-র মতো দুটি নাটক।

৮.৬। মঞ্চ-প্রযোজনা ও রবীন্দ্র ভাবনা

রবীন্দ্রনাথের নাটকের নাট্যগুণ অথবা অভিনয়যোগ্যতা নিয়ে একসময়ে আমাদের সমালোচক মহল তোলপাড় হয়েছিল। সে যুগের পেশাদার দর্শক তো বটেই এমনকী এযুগের স্বনামধন্য কিছু সমালোচকও রবীন্দ্রনাথের নাটকের বেশি শিল্পিত ও দুর্বোধ্য। আসলে প্রচলিত নাটকে নাট্যসংঘাত সৃষ্টি হয় প্রধানত ঘটনা-চরিত্র, চরিত্র-চরিত্রের পারস্পরিক সংঘাতের ফলে। প্রথাগত এই রীতিতে যে নাট্যসংঘাত সৃষ্টি হয়, আপামর দর্শক মঞ্চে তা প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তারই ভিত্তিতে নাটকের গুণাগুণ বিবেচিত হয়। এমনকি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এই অভ্যাসের বশেই নাটক সমালোচিত হত। কিন্তু প্রথাগত নাটকে চালু বাহ্যিক নাট্যসংঘাত রবীন্দ্রনাটকে খুব কমই দেখা যায়।

বিশেষ করে 'শারদোৎসব' থেকে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন নাট্যরীতির সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, সাধারন রঙ্গালয় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেই বলা চলে। এর কারণ সম্ভবত রবীন্দ্রনাটকে প্রথাগত বাহ্যিক নাট্যসংঘাতের অপ্রতুলতা। আসলে রবীন্দ্রনাথের নাটকের অন্তর্নিহিত সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলার এবং তাকে গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি সাধারণ রঙ্গালয়ের ছিল না।

১৯০২-এ লেখা 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তার কিছু অংশ দেখে নেওয়া যাক।-

(ক) "ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নেই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবি কল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।"

(খ) "বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ । ... দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুস্তানের মতো কাজ হয়"।

(গ) "আমাদের দেশের যাত্রা আমার এ জন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে।"

নাটক-অভিনয়ের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা প্রচলিত নাট্যরীতির ঠিক বিপরীত বরং লোক-নাটক বা লোকযাত্রার সঙ্গেই তাঁর নাট্যভাবনার সাদৃশ্য বেশি। এই নতুন বা অভিনব মৌলিক নাট্যরীতির প্রয়োগ তিনি ঘটাতে চেয়েছিলেন 'শারোদোৎসব' নাটক থেকে। তিনি নিজে নিজের নাটকে অভিনয় করেছিলেন। বহু নাটকের অভিনয় পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকো অথবা শান্তিনিকেতনে মঞ্চাভিনয়ের স্বকীয় পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই অভিনয় প্রচেষ্টাকে শঙ্খ ঘোষ - "সে আমলের লিটল থিয়েটার, ব্যবসায়িক মঞ্চাভিনয়ের পাশাপাশি এক প্রচ্ছন্ন কিন্তু সংগঠিত আর ধারাবাহিক প্রবাদ" হিসেবে দেখেছেন। (শঙ্খ ঘোষ, 'অভিনয়ের মুক্তি এবং রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ, গ্রন্থ – 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক')

কী এমন অভিনবত্ব ছিল রবীন্দ্রনাটক অথবা রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ-ভাবনার মধ্যে? আমরা তাঁর মঞ্চভাবনার বৈশিষ্টগুলিকে খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। যেমন 'শারদোৎসব' থেকে তাঁর নাটকগুলিতে প্রথাগত দৃশ্য ও মঞ্চ ধারণার পরিবর্তে আপাত দৃশ্যহীন পথ ব্যঞ্জিত হচ্ছে। প্রথাগত মঞ্চবিন্যাসে ধরা চলে না সেই সমস্ত দৃশ্যপথ। অনেকে এই

ধরনের দৃশ্যপথের মধ্যে পথনাটকের অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন, কেউ বা একে ‘লোক জীবনের সঙ্গে ঘন সম্পর্কে যোজিত এক নাট্যরূপ’ বলেছেন। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে বাহ্যিক অর্থে নাট্যসংঘাত নেই, যা প্রচলিত নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে নাট্যসংঘাত সৃষ্টির অন্যতম উপায় হিসেবে দেখা যায়। তার পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনীত চরিত্রের অন্তর্সংঘাত মুখ্য হয়ে উঠছে। এই কারণে শারীরিক ক্রিয়াশীলতার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে অভিনেতার সংলাপ ও কণ্ঠস্বর। সেই সংলাপের ভাষায় থাকছে কবিতার লাবণ্যমাখা নাট্যমুহূর্ত যা আমরা ‘বহুরূপী’ অভিনীত ‘রক্তকরবী’ নাটকে তৃপ্তি মিত্র শম্ভু মিত্রর কণ্ঠস্বরে ও অভিনয়ে পেয়েছি। এছাড়া আছে সংগীতের বহুল প্রয়োগ যা সংলাপের গদ্যময়তার পরিবর্তে নিয়ে আসছে সাংগীতিক ব্যঞ্জনা। এর অভিনয় তাই কখনই-প্রথাগত নাট্যরীতিতে সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পেশাদার রঙ্গমঞ্চের পাশাপাশি স্বকীয় এই বিকল্প হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পরে ‘বহুরূপী’ নাট্যদল যখন রবীন্দ্রনাটকের এই অন্তর্নিহিত নাট্যব্যঞ্জনাকে রূপ দিতে শুরু করে, তখন থেকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যভাবনাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে শুরু করেছি। সেই আরিষ্কারের ধারা আজও চলেছে সমানতালে।

৮.৭। অনুশীলনী

১। রক্তকরবী নাটকটি সৃষ্টির পিছনে সমকালীন রাজনীতি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে আপনি মনে করেন?

২। রক্তকরবী নাটক সৃষ্টির পিছনে তৎকালীন আর্থসামাজিক পটভূমির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩। রক্তকরবী নাটকটি সৃষ্টির পশ্চাৎপটে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিমন্ডলের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪। রক্তকরবী নাটকের পটভূমি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

৫। রক্তকরবী রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় মঞ্চ ভাবনার অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায় - মন্তব্যটির প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ ভাবনার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৮.৮। গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস - অজিতকুমার ঘোষ।

২। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী।

৩। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা - উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৪। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা - নীহাররঞ্জন রায়।

৫। রক্তকরবী: পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ - সম্পাদনা - প্রণয়কুমার কুন্ডু।

৬। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক - শঙ্খ ঘোষ।

৭। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ - শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়।

৮। নাটক ‘রক্তকরবী’ - শম্ভু মিত্র।

৯। রক্তকরবী অন্য ভাবনায় – সৌমিত্র বসু।

একক: ৯। রক্তকরবী: লেখক ও গ্রন্থপরিচয়

বিন্যাসক্রম

৯.১। লেখক পরিচিতি

৯.২। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-চর্চা

৯.৩। নামকরণ প্রসঙ্গ

৯.৪। কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৯.৫। রক্তকরবী প্রসঙ্গে সমালোচকদের অভিমত

৯.৬। রক্তকরবীর ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গ

৯.৭। অনুশীলনী

৯.৮। গ্রন্থপঞ্জি

৯.১। লেখক পরিচিতি

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (৭মে, ১৮৬১) রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ছিলেন ঠাকুর পরিবারের অন্যতম প্রাণপুরুষ। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) উনিশ শতকীয় বাংলার জাগরণের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে পিতা দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা যে কতখানি ছিল রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তা স্বীকার করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল, কৈশোর ও প্রাকযৌবনের দিনগুলি কাটে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। ভৃত্য-শাসনের চৌহদ্দিতে বন্দি কবির ছেলেবেলার দিনগুলির আশ্চর্য মায়াময় বিবরণ পাওয়া যায় আশি বছর বয়সে লেখা কবির আত্মবিবরণী ‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থে। প্রথাগত স্কুল শিক্ষার প্রতি কবির বিরাগ খুব ছোটো থেকেই ছিল। স্কুল কলেজ নয়, রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা চলত সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে বিচিত্র রুটিন মেনে। তবে রুটিনের

বাইরে সাহিত্যের পড়াশোনা ও তার চর্চাতেই কবির মন বেশি নিবিষ্ট হয়ে থাকত। ‘বিবিধার্থ-সংগ্রহ’, ‘বঙ্গদর্শন’ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা, কালিদাসের নাটক, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব-সংগীত থেকে শুরু করে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠও নিয়েছিলেন ছোটোতেই। কৈশোরেই তাঁর সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল। পারিবারিক সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি, সংগীত-চর্চা ও নাট্যাভিনয়-চর্চাও রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভাকে বিকশিত হতে সাহায্য করে।

১৮৭৩-এ উপনয়নের পর রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে প্রথম হিমালয় ভ্রমণে যান। হিমালয় ভ্রমণ সেরে আসার পরেই তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। ১৮৭৮-এ প্রথমবার এবং ১৮৯০-এ দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডে যান। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ - ১৮৭৮ এ ‘কবিকাহিনী’। ১৮৯০-এ ‘মানসী’ প্রকাশিত হওয়ার পর কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯০-এ পৈত্রিক জমিদারি দেখাশোনার ভার এসে পড়লে শিলাইদহে বসবাস শুরু করেন এবং সাহিত্য রচনায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৮৯১-এ ‘হিতবাদী’-র সাহিত্য সম্পাদক ১৮৯৫-এ ‘সাধনা’ ও ১৮৯৮-এ ‘ভারতী'-র সম্পাদনার ভার গ্রহণ ও সেই সূত্রে বহু বিচিত্র সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত। জীবনের ব্যস্ততম সময় এবং সাহিত্যচর্চার সেরা সময় বোধহয় এটিই।

বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সূত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। পরে আশাহত হয়ে দূরে সরে যান ও পল্লিসংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৩ তে ‘গীতাঞ্জলি’র অনুবাদ করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এরপর থেকেই তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক-চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাত হয়ে ওঠেন। সাহিত্যচর্চাতেও বিপুল পালাবদল ঘটে। ১৯০১-এ শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাই ক্রমে মহীরুহ হয়ে ওঠে ‘বিশ্বভারতী’-রূপে। ১৯২১-এ জাতির উদ্দেশে বিশ্বভারতীকে উৎসর্গ করেন। জীবনের শেষ কুড়ি বছরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা বিপুল বৈচিত্র্যে ও বিপুল সম্ভারে ভরে উঠেছিল। বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন, বহু দেশের আমন্ত্রণে বক্তৃতা দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্ব কবির বাণী শোনার জন্য উৎসুক হয়েছিল। জীবনে অগণিত সম্মান, অজস্র পুরস্কার ও সংবর্ধনা তিনি লাভ করেছিলেন। বাঙালির

আত্মগঠনে ও বাংলার সমাজ সংস্কৃতিকে গড়ে তোলার পিছনে রবীন্দ্রনাথের দান অসামান্য। ১৯৪১-এ প্রয়াত হলেও আজ একবিংশ শতকের এই বাজার-অর্থনীতি-সর্বস্ব ভোগবাদী সমাজে তিনি অনেক বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-রচনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে আপনাদের তৃতীয় পত্রের প্রথম অর্ধের পর্যায় - গ্রন্থ-১ -এর 'চিত্রা' গ্রন্থে। উৎসাহী পাঠক তা পড়ে নিতে পারেন।

৯.২। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-চর্চা

রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল কৈশোরকালেই তাঁর পারিবারিক নাট্যচর্চার সূত্রে জোতিরিন্দ্রনাথের নাটক রচনা ও সখের মঞ্চাভিনয় ঠাকুরবাড়িতে যে নাট্যচর্চার পরিবেশ গড়ে তুলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সে সবের মধ্যেই তাঁর নাটকচর্চার প্রেরণাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। মাত্র তের বছর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে 'জ্বল্ জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' -সংগীতটি রচনা করেন। এভাবেই নাট্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের হাতে খড়ি হয়। ঠাকুরবাড়িতে 'বিদ্বজ্জনসমাগম'-হলে রবীন্দ্রনাথের উপর দায়িত্ব পড়ে কিছু লেখার। এই তাগিদেই লেখা হয় 'বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৮৮১) এবং তা অভিনীতও হয়। রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন বাল্মীকি। ওই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) নাটিকা ও 'কালমৃগয়া' (১৮৮২) গীতিনাট্য রচনা করেন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ আরও দুখানি নাটক রচনা করেন। একটি হল 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) নাট্যকাব্য এবং অন্যটি 'নলিনী' (১৮৮৪) নামক নাটক।

'রাজা ও রানি' (১৮৮৯) এবং 'বিসর্জন' (১৮৯০) সেক্সপিয়রের পঞ্চমাঙ্ক নাটকের স্বীকৃত ছাদ মেনেই রচিত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দশকটিতে তিনি দুখানি লঘু রসের নাটকও লেখেন 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২) এবং 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭)।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যদর্শনে এক গভীর পরিবর্তনের সূচনা হযেছিল। যে প্রথানুগত্য 'রাজা ও রানি' বা 'বিসর্জন'-এ দেখা গিয়েছিল, তা থেকে সরে আসার ইঙ্গিত পাওয়া গেল 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) বা 'মালিনী' (১৮৯৬) -র মধ্যে কিংবা

১৯০০-য় প্রকাশিত ‘কাহিনী’ -গ্রন্থের নাট্যকাব্য গুলির মধ্যেও। ঘটনানির্ভর প্রত্যক্ষ নাট্যসংঘাতের পরিবেশ এই রচনাগুলির মধ্যে সেভাবে আসেনি এবং চরিত্রের অন্তসংঘাতই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

ঠিক এই প্রবণতা থেকেই বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষে তিনি খুঁজে পেলেন নিজস্ব এক প্রকাশভঙ্গি। নাট্যরচনায় প্রথাগত রীতিকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে তিনি নির্মাণ করে নিলেন সম্পূর্ণ নিজস্ব এক নাট্যরীতি, যাকে শঙ্খ ঘোষ ‘নাট্যমুক্তি’ আখ্যা দিয়েছেন। এই পর্বের নাটকগুলি হল যথাক্রমে – ‘শারদোৎসব’ (১৯০৮), ‘রাজা’ (১৯১০), ‘অচলায়তন’ (১৯১২), ‘ডাকঘর’ (১৯১৮), ‘ফাল্গুনী’ (১৯১৬), ‘মুক্তধারা’ (১৯২২), ‘রথযাত্রা’ (১৯২৩) , ‘রক্তকরবী’ (১৯২৬), ‘তাসের দেশ’ (১৯৩৩) প্রভৃতি।

এই পর্বের নাটকগুলিকে এক শ্রেণির সমালোচক ‘রূপক সাংকেতিক’ বা ‘তত্ত্বনাট্য’ আখ্যা দিয়েছেন। যদিও এমন কোনো আখ্যায় রবীন্দ্রনাথ এই নাটক গুলিকে আখ্যাত করতে চাননি। এই শ্রেণির নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সাধারণ কিছু প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন- প্রতিটি নাটকের বিষয় গড়ে উঠেছে মূলত জড় ও প্রাণের, বন্ধন ও মুক্তির বিরোধ নিয়ে। এই বিরোধ রবীন্দ্রনাথের নাট্যমুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার মনে করেছেন। তাছাড়া নাটকগুলিতে প্রথাগত দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চ ধারণার পরিবর্তে আপাত দৃশ্যহীন পথ ব্যঞ্জিত হয়ে উঠছে। ঠিক অনেকটা আমাদের লোকনাট্য বা যাত্রার সঙ্গেই এর সাদৃশ্য বেশি। বাহ্যিক নাট্যসংঘাতের পরিবর্তে চরিত্রের অন্তসংঘাত মুখ্য হয়ে উঠছে। নাট্য সংলাপের ভাষায় উঠে কবিতার লাবণ্যমাখা নাট্যমুহূর্ত। এছাড়া এসেছে সংগীতের বহুল প্রয়োগ। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে বলা যেতে পারে পেশাদার রঙ্গালয়ের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের এক স্বকীয় নাট্যভাবনা, যাকে তিনি জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনের নাট্যভিনয়ে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন।

জীবনের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরীতির এই কাঠামোকেও ভেঙে চুরে নতুন এক পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকে এগিয়েছিলেন। সেখানে সংলাপের ভাষাতে গড়ে উঠল এক ধরনের সাংগীতিক কাঠামো । নাট্য আঙ্গিকের অভিনব প্রযোজনা রূপ পেল তাঁর বেশ কিছু নৃত্যনাট্যে। নৃত্যই হয়ে উঠল অভিনয়ের উপায় আর সে নৃত্যে মিশে গেল

সর্বভারতীয় নৃত্যভঙ্গিমা। এই পর্বে রচিত তাঁর ‘বসন্ত’, ‘তাসের দেশ’, ‘বাঁশরী’, ‘চন্ডালিকা’, ‘শ্রাবণগাথা’, ‘নটীর পূজা’, ‘শ্যামা’ প্রভৃতি নাট্যরচনাগুলিতে এই নৃত্যকল্পনার অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চা জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন প্রবাহের মধ্যে দিয়ে খুঁজে নিতে চেয়েছে আত্ম প্রকাশের নতুন ভঙ্গি।

৯.৩। নামকরণ প্রসঙ্গ

‘রক্তকরবী’ নাটক সৃষ্টির পিছনে সমকালীন আর্থ সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি কতখানি দায়ী ছিল সে সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী এককে আলোচনা করেছি। এই উপ-এককটিতে আমরা দেখব এই রচনার পিছনে আর কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণা কিছু আছে কিনা।

রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ লিখতে শুরু করেন ১৯২৩-এ গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে শিলং-এ থাকাকালে । কবি শিলং-এ যে বাড়িতে থাকতেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সেখানে প্রায়ই আসতেন। ‘রবীন্দ্রজীবনী’ রচয়িতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন রাধাকমল আলাপচরিতার সময় কবিকে প্রায় 'গল্পচ্ছলে' বোম্বাই-এর শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা করে শোনাতেন। কবি তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। প্রসঙ্গটির বর্ণনা দিয়ে প্রভাতকুমার লিখেছেন- ‘তখন কি তিনি জানিতেন যে কবির মনে একটি নাটকের প্লট জুটিতেছে।' ‘নাটক’ বলতে তিনি এখানে ‘রক্তকরবী’-র কথাই বলেছেন। ‘রক্তকরবী’র সৃষ্টির এটি একটি প্রেরণা হওয়া সম্ভব, যদিও এটিই একমাত্র কারণ সে কথা বলা যাবে না।

‘রক্তকরবী’-নাটকটির এই নামকরণের পিছনেও আছে আর এক প্রেরণা। প্রমথনাথ বিশী তাঁর ‘রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ’ গ্রন্থে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীকে বলা রবীন্দ্রনাথের একটি কথা উল্লেখ করেন গ্রন্থের নামকরণের তাৎপর্যের কথা বলতে গিয়ে। কথাটি হল, বাড়ির পাশেই লোহালক্কড়ের আবর্জনার স্তুপ ভেদ করে একটি সুকুমার করবীশাখাকে লাল ফুল বুকে নিয়ে উদ্ধত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন রবীন্দ্রনাথ। ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথকে দারুণ প্রভাবিত করেছিল। এই দৃশ্য দেখবার পর রবীন্দ্রনাথ এমন কথা বলেছিলেন যে,

'নাটকটাকে যক্ষপুরী, নন্দিনী প্রভৃতি বলে আমার তৃপ্তি হয়নি। তাই নাম দিলাম ‘রক্তকরবী' অবশ্য রক্তকরবীর লাল রঙের ব্যঞ্জনায় অনেকে ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার হে মার্কেটে শ্রমিকদের আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট ও রক্তঝরা সংগ্রামের যোগসূত্র খুঁজেছেন। এমনকী ১৯১৭ তে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের লাল প্রতীককেও অনেকে রক্তকরবীর লাল রঙের তাৎপর্যময়তা কাছাকাছি রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নাটকটির নাম একসময় ‘নন্দিনী’ রেখেছিলেন। আসলে এই নাটকের নায়িকা এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিনীর -এই নামটির এবং চরিত্রটি প্রেরণারও একটি বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে শিলং বেড়াতে যান, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাণু অধিকারী। এই কিশোরীই নাকি ‘রক্তকরবী’র নন্দিনী চরিত্রের প্রধান প্রেরণা। এসম্পর্কে প্রণয়কুমার কুন্ডু ‘রক্তকরবী’-র পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ গ্রন্থের ‘গ্রন্থ প্রসঙ্গ'-তে লেডি রানু মুখোপাধ্যায়ের (অধিকারী) একটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক বিবরণের কথা উল্লেখ করেছেন। ওই বিবরণ থেকে জানা যায়, কবি যখন ‘রক্তকরবী’ রচনায় ব্যস্ত, তখন কবির চারপাশে রাণু প্রায় দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে বলতেন – ‘নন্দিনী তুই’। রাণুর এই স্বীকারোক্তি যদি সত্য হয় তাহলে চরিত্রটির মূলে রাণুর প্রেরণার কথা অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কৃপালনির রবীন্দ্রজীবনীতে লেনার্ড এলমহাস্ট-এর একটি আলাপচরিতা বর্ণিত হয়েছে। এলমহাস্ট-এর কথা অনুসারে 'রক্তকরবী' নাটকের রঞ্জন নন্দিনী ও রাজা - এই তিনটি চরিত্রের পরিকল্পনায় এলমহাস্ট - রাণু - রবীন্দ্রনাথের ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কের প্রেরণা রয়েছে। বলা চলে এলমহাস্টের এই ইঙ্গিতে নাটকের নামকরণ এক অন্য ব্যঞ্জনা পেয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ‘রক্তকরবী’ -রচনার পিছনে বিদেশি নাটকের অনুকরণের কথা বলেছেন প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস। (অনুষ্টূপ প্রবন্ধ সংকলন – ‘রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী : তথ্য ও তত্ত্ব’ - প্রবন্ধ) প্রতাপনারায়ণ ‘রক্তকরবী’ নাটকটিকে সুইডিশ নাট্যকার স্ট্রিন্ডবার্গ-এর ‘A Dream Play’-নাটকের হুবহু নকল বলে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। অবশ্য শঙ্খ ঘোষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে ও মৃদুভাষে প্রতাপনারায়ণের

এই গুরুতর অভিযোগের উত্তরও দিয়েছেন একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে। (রক্তকরবী : কয়েকটি তথ্য)। উৎসাহী পাঠক তা পড়ে নিতে পারেন।

৯.৪। কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'রক্তকরবী' নাটকটির কাহিনি একটি শহর বা নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই শহরটি হল যক্ষপুরী। যক্ষপুরীতে একটি সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। চারিদিকে শক্ত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই শহরে বাইরে থেকে আসা শ্রমিকরা দিনরাত্রি পরিশ্রম করে খনির গহ্বর থেকে সোনা তুলে আনছে। সেই শ্রমিকদের পরিচালনা করা ও কাজ-কর্ম দেখাশোনার জন্য যক্ষপুরীর রাজা বেশ শক্ত পোক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। রাজা এখানে একটি জালের আবরণ-ঘেরা ঘরের মধ্যে থাকেন। একটি মাত্র জানালার মধ্যে দিয়ে তিনি বাইরের মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই রাজা কাজ কর্ম চালান তার একান্ত অনুগত পার্ষদদের দ্বারা। এই পার্ষদদের মধ্যে সবার উপরে আছেন সর্দাররা। সর্দাররা আবার কাজকর্ম পরিচালনা করেন মোড়লদের দ্বারা। বিভিন্ন পাড়ার স্বতন্ত্র মোড়ল আছে। মোড়ল ছাড়াও আছে স্পাই অর্থাৎ চর ও অনুচর, প্রহরী এবং সৈন্যদল।

যক্ষপুরীর এঁরা হলেন শাসক শ্রেণি। এই শাসকরা প্রজাদের শোষণ করে, তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। শ্রমিকদের কাজই হল দিনরাত্রি পরিশ্রম করে খনি থেকে সোনা তুলে আনা । খোদাইকররা কর্তৃপক্ষের কাছে সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত, ব্যক্তিনামে নয়। শোষিত প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বা বিদ্রোহ যাতে না জমতে পারে, তার জন্য কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি। এদের জন্য কোয়ার্টারস দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য আছেন অধ্যাপক, পুরাণবাগীশ। ধর্ম উপদেশ দেওয়ার জন্য আছেন গোঁসাইরা। বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য আছে বন্দিশালা। মনুষ্যত্বহীন এই যক্ষপুরীর প্রাণহীন চেতনাহীন মানুষদের মাঝে হঠাৎই নন্দিনী বলে এক মানবী এসে পড়েছে। তাকে ঘিরে যক্ষপুরীর নিষ্প্রাণ মানুষগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে প্রাণের চাঞ্চল্য।

নাটকের শুরুতে কিশোরকে দেখি নন্দিনীর সঙ্গ পাওয়ার জন্য সে ব্যাকুল। অধ্যাপকও চায় নন্দিনীর সঙ্গ। নন্দিনীর কথায় জানা যায় রঞ্জন - তার প্রেমাস্পদ যক্ষপুরীতে

আসবে। আজ তার সঙ্গে নন্দিনীর দেখা হবে। এই কথা জানাতেই নন্দিনী রাজার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু রাজার চিত্ত বেশ ব্যাকুল। সম্ভবত নন্দিনীর সঙ্গ তার ভিতরকার মানুষটাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। ঠিক একই রকম চিত্ত চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায় ফাগুলাল ও বিশুর মধ্যেও। নন্দিনী বিশুকে নিয়ে রঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করতে যায়।

এদিকে রঞ্জনকে যক্ষপুরীতে নন্দিনীর সঙ্গ কিছুতেই মিলতে দিতে চায় না সর্দাররা। তাই মোড়ল ও ছোটসর্দারের উপর ভার পড়েছে রঞ্জনকে বন্দি করে রাজার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার। এদিকে নাছোড়বান্দা নন্দিনীকে রাজা কথা দেয় রঞ্জনকে তার কাছে এনে দেবে বলে। কিন্তু সর্দার গোপনে পরিকল্পনা করে রঞ্জনকে বন্দি করে রাজার ঘরে পাঠিয়ে দেয়। স্পর্ধিত যৌবন রঞ্জনকে সহ্য করতে না পেরে রাজা তাকে হত্যা করে। অবশ্য রাজা জানত না যে সেই-ই রঞ্জন।

এদিকে নন্দিনীকে কাছে পেয়ে খোদাইকর বিশুর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । তাকেও সর্দার বন্দি করে নিয়ে গেলে খোদাইকরের দল প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রঞ্জনের খোঁজে কিশোর রাজার ঘরে গেলে রাজা তার স্পর্ধা সহ্য করতে না পেরে কিশোরকেও হত্যা করে। শেষ মুহূর্তে ফাগুলাল দলবল জুটিয়ে বন্দিশালা ভাঙবার জন্য এগিয়ে যায়। অন্যদিকে নন্দিনী রাজার কাছে যায়। সে রাজাকে দরজা খুলতে বলে। প্রচণ্ড এক উত্তেজনার মুহূর্তে রাজা ভেঙে ফেলে তার জালের দরজা। নন্দিনী দেখতে পায় মৃত রঞ্জন ও কিশোরকে। রাজাও এবার নিজের ভুল বুঝতে পারে। সে বুঝতে পারে সর্দার তাকে ঠকিয়েছে। বুঝতে পারে নিজের যন্ত্র তাকে আর মানছে না। তখন রাজা নিজের ধ্বজাদণ্ড ভেঙে ফেলে। এদিকে ফাগুলালের দলবল বন্দিশালা ভেঙে ফেলে। মুক্ত হয় বিশু। সর্দারও সৈন্যদল নিয়ে প্রস্তুত। এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে যায় নন্দিনী। তাকে অনুসরণ করে লড়াইয়ে ছুটে যায় রাজা এবং বিশু শেষ মুক্তির দিকে।

৯.৫। রক্তকরবী প্রসঙ্গে সমালোচকদের অভিমত

'রক্তকরবী'- এমন এক শ্রেণির নাটক, যাকে নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে দ্বিধা বা বিতর্কের শেষ নেই। প্রকাশের পর থেকেই বিভিন্ন সমালোচক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ্ থেকে নাটকটিকে

দেখেছেন। ফলে নাটকটি সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' গ্রন্থের রচয়িতা প্রমথনাথ বিশী এই নাটকটিকে জড় ধর্মের সঙ্গে প্রাণ ধর্মের দ্বন্দ্বের নাটক বলেছেন। তাঁর মতে-"রক্তকরবী - নাটকখানিকে বিশেষভাবে যন্ত্রবাদসমস্যার কথা বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। বড় জোর যন্ত্রবাদের একটি উপলক্ষ মনে করা যাইতে পারে।... জড়ধর্মের সঙ্গে প্রাণধর্মের দ্বন্দ্ব প্রদর্শনই এই নাটকের মুখ্য লক্ষ্য।" (রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ)

নাটকের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য- "নাটকখানির পাত্রপাত্রী কেহই ব্যক্তিবিশেষ নয়- সকলেই শ্রেণিবিশেষ, কেহই ব্যক্তিরূপ নয় - সকলেই শ্রেণিরূপের প্রতিনিধি। প্রতিনিধি মানেই এক প্রকার প্রতীক।... কেবল নন্দিনীতে বিশিষ্ট গুণ বা ব্যক্তিত্বের কিছু লক্ষণ আছে।

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা সুকুমার সেন বলেছেন-"রক্তকরবী (১৯২৪) রবীন্দ্রনাথের কঠিনতম ভাবনাট্য। রূপক ও গল্প কাহিনীতে অবিচ্ছেদ্যভাবে জমাট বাঁধিয়াছে। কেন্দ্রিয় ভূমিকা নন্দিনীর সাজ রক্তকরবী ফুলে, এবং এই ফুল দিয়া অথবা না দিয়া তাহার প্রেমও প্রীতির গতি সূচিত। তাই নাটকটির 'রক্তকরবী' নাম অতিশয় সঙ্গত।" (বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস)

অন্যদিকে 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' রচয়িতা অজিতকুমার ঘোষ 'রক্তকরবী' নাটকে কাব্যরসের আধিক্য, পক্ষান্তরে নাট্যসংঘাতের অভাব লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে - "একটি নির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ স্থানে সমগ্র ঘটনার অবতারণার জন্য স্বভাবতই নাটকের গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই নাটকে নাট্যকার চরিত্রগুলির কথার সৌন্দর্যের দিকে যত দৃষ্টি দিয়োছেন গতির দিকে তত দৃষ্টি দেন নাই। ... রূপক-শ্লেষ- বিরোধ প্রভৃতি অলংকার সৌন্দর্যে চিত্র ও সংগীতের সরসতায় নাটকখানি একটি অনবদ্য কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস)

'রক্তকরবী' সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখা যায় একালের সমালোচকদের মধ্যে। যেমন শঙ্খ ঘোষ এ নাটকের বাহির-আবয়বে স্থান ও কালগত ঐক্যের মায়াকে লক্ষ করেছেন। তাঁর ভাষায় - "অনেক টুকরো টুকরো সময়ের খণ্ড নিয়ে যেমন 'রক্তকরবী'-

র একটি ঐক্যময় আপাত সময়, তেমনি অনেক টুকরো টুকরো পট নিয়ে তার ঐক্যময় পথ, আপাত পথ।" আবার "প্রচ্ছন্ন গড়নে এ নাটক ছড়িয়ে আছে বৃহত্তর কালের মধ্যে।" (কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক)। আবার 'রক্তকরবী' নাটককে প্রথম গ্রুপ থিয়েটারে এনে যিনি রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ে যুগান্তর এনেছিলেন সেই শম্ভু মিত্রের চোখে নাটকটি 'সত্যমূলক' হয়ে উঠেছে একটু অন্যভাবে। তাঁর মতে বিশ্বজোড়া ইনডাসস্ট্রিয়ালাইজেশন এবং যন্ত্ররনির্ভর প্রাচুর্য নিয়ে যে সংগঠিত শোষণ মানুষকে জটিল ফাঁসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, রক্তকরবী তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁর কথায় -"সংগঠিত শক্তির সামনে ব্যক্তিগত মানুষের অবমাননা রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তাঁর যক্ষপুরীতে। তিনি আশা করেছিলেন যে, মানুষের অদম্য প্রাণশক্তিই তাকে বাঁচাবে।" (নাটক : রক্তকরবী)। অন্যদিকে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'রক্তকরবী'-র মধ্যে সমকালীন ও পরবর্তীকালীন ঐতিহাসিক এক ইঙ্গিত পেয়েছেন। তাঁর মতে 'রক্তকরবী' নাটকটি বৈপরীত্যের লড়াই। শহরকেন্দ্রিক ধনসম্পদ বৃদ্ধির বদলে গ্রামাঞ্চলের যৌথ কর্মসাধনার মধ্যে দিয়ে যৌথশক্তির একত্র সমবায় ও তার জাগরণের কথাই নাটকটিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

৯.৬। রক্তকরবীর ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গ

'রক্তকরবী' নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ 'Red Oleanders' প্রকাশিত হয় 'বিশ্বভারতী কোয়াটারলি'-র বিশেষ শারদীয়া সংখ্যায় (১৯২৪)। পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এরপরে গ্রন্থাকারে 'Red Oleanders' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫-এ ম্যাকমিলান কোম্পানির লন্ডন শাখা থেকে। 'রক্তকরবী'-র প্রচলিত বাংলা সংস্করণের প্রায় হুবহু অনুবাদ হল এই 'Red Oleanders'। 'প্রায় হুবহু' এই কারণে বলা হচ্ছে যে, বাংলা থেকে অনুবাদের সময় বেশ কিছু সংলাপ পরিবর্তিত হল বর্জিত হয়েছে। যেমন - বাংলা অনুবাদ শুরু হয়েছে কিশোরের 'নন্দিনী! নন্দিনী! নন্দিনী!' - ডাকে কিন্তু ইংরেজি অনুবাদে নাটকটির সূচনা হয়েছে কিশোরের এই সংলাপ দিয়ে "Have you enough flowers, Nandini? Here, I Have brought some more." বোঝা যায় মূল নাটকের দশম খসড়ার অনুবাদ 'Red Oleanders'।

'রক্তকরবী'-র অনুবাদ কে করেন এনিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে জানা যায় প্রথমে তিনি নাটকটির ইংরেজি অনুবাদের ভার দেন ইন্দিরা দেবীকে। পরে ইন্দিরা দায়িত্ব না নিলে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই দায়িত্ব দেন। অবশ্য এরও আগে 'রক্তকরবী'-র প্রাথমিক কাঠামো অনুবাদের জন্য প্রথমে ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এবং পরে অমিয় চক্রবর্তীর কথাও বলেন। কিন্ত এঁদের কেউ যে 'রক্তকরবী' অনুবাদক এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় যে 'রক্তকরবী'র ইংরেজি অনুবাদের একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপিটি হাতে লেখা নয়, টাইপ করা প্রথম কপি। টাইপটি প্রধানত ইন্দিরা দেবী এবং অংশত রবীন্দ্রনাথের হাতে সংশোধিত হয়েছে। 'রক্তকরবী'-র খসড়াগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেছে এই টাইপকপিটি ষষ্ঠ খসড়ার অনুসরণে অনুবাদ করা হয়েছিল। প্রকাশিত 'Red Oleanders'-এর সঙ্গে টাইপটির পার্থক্য প্রচুর।

'Red Oleanders'-এ 'রক্তকরবী' প্রচলিত সংস্করণ থেকে যেটুকু পরিবর্তন আছে, তার গুরুত্বও কম নয়। আমরা দুটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ সংলাপের পরিবতনকে তুলে ধরছি। এ থেকে অনুবাদটির গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে।

১। কিশোরের সংলাপ - "বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান" এই সংলাপ অংশটি 'Red Oteanders' এ - "I've always envied Bishu, he can sing to you songs that are his own" এখানে 'envied' বা ঈর্ষা - শব্দের প্রয়োগ সংলাপটির তাৎপর্যকেই বদলে দিয়েছে।

২। নন্দিনীর সংলাপ ছিল - "জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী"। এই সংলাপটিই ইংরেজি অনুবাদে হয়েছে - "Wake Ranjan, it is I, your Red oleanders।" এখানে 'সখী'-র পরিবর্তে 'Red Oleanders' -এর প্রয়োগ অনেক বেশি ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

৯.৭। অনুশীলনী

১। 'রক্তকরবী' কখন প্রকাশিত হয়? নাটকটির বিভিন্ন সংস্করণের পরিচয় দিন।

২। রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

৩। 'রক্তকরবী' রচনার পিছনে কোন্ প্রেরণা কাজ করেছে বলে আপনি মনে করেন।

৪। 'রক্তকরবী' নাটকটি সম্পর্কে সমালোচকরা অনেকক্ষেত্রেই দ্বিমত পোষণ করেছেন। সেকাল ও একালের কয়েকজন রবীন্দ্র-নাটক সমালোচকের মতামত তুলে ধরে সে সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন।

৫। 'রক্তকরবী'-র কাহিনির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নাট্যকারের বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট করুন।

৯.৮। গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস - অজিতকুমার ঘোষ।

২। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী।

৩। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা - উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৪। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা - নীহাররঞ্জন রায়।

৫। রক্তকরবী: পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ - সম্পাদনা - প্রণয়কুমার কুন্ডু।

৬। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক - শঙ্খ ঘোষ।

৭। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ - শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়।

৮। নাটক 'রক্তকরবী' - শম্ভু মিত্র।

৯। রক্তকরবী অন্য ভাবনায় – সৌমিত্র বসু।

একক: ১০। রক্তকরবী: সার্বিক পর্যালোচনা

বিন্যাসক্রম

১০.১। রক্তকরবী নাটকের প্রধান বক্তব্য বিষয়

১০.২। রক্তকরবী নাটকের সমাজ বাস্তবতা প্রসঙ্গ

১০.৩। রক্তকরবী নাটকে পুঁজিবাদী শোষণের রূপ চিত্র

১০.৪। রক্তকরবী নাটকের কেন্দ্রীয় সংঘাত প্রসঙ্গ

১০.৫। রক্তকরবী নাটকে পুরাণ ভাবনা

১০.৬। রক্তকরবী নাটকের চরিত্র চিত্রণ

১০.৭। অনুশীলনী

১০.৮। গ্রন্থপঞ্জি

১০.১। রক্তকরবী নাটকের প্রধান বক্তব্য বিষয়

রবীন্দ্রনাথ 'কবির অভিভাষণ'-এ 'রক্তকরবী' নাটকটিকে সত্যমূলক বলেছিলেন। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেছেন- "বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যারা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তারা জানবেন এটিও সত্যমূলক।" এই নাটকে ফক্ষপুরীর রূপকে কবি আধুনিক সভ্যতার আত্মঘাতী মূঢ়তা যেভাবে মনুষ্যত্বকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, তারই বিরুদ্ধে শিল্পীও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অশোক সেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাত্য-পরিক্রমা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- "পাশ্চাত্যের ধনিক সম্প্রদায় পরিচালিত যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব, জড়বাদ, বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহার প্রভৃতি ক্রমাগত মানুষকে কীভাবে পশুত্বের স্তরে লইয়া যাইতেছে, গভীর অন্তদৃষ্টির সাহায্যে তাহারই স্বরূপকে কবি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এই নাটকটিতে।"

নাটকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন- "কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগে কৃষিপল্লিকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে।"('কবির অভিভাষণ') এই নাটকের যক্ষপুরীর সোনার খনি সেই শোষণজীবী, আকর্ষণজীবী সভ্যতার রূপক বলা যেতে পারে। সেখানে মানুষের ব্যক্তিত্ব পদে পদে খর্ব হচ্ছে যন্ত্রসভ্যতার ক্রম-আগ্রাসনে কিংবা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। পুঁজিবাদী সভ্যতায় রাজার তৈরি এই যন্ত্র (System) মানুষকে শুধু আর্থিকভাবেই শোষণ করেনি, মনুষ্যত্বকেও হরণ করেছে। কিন্তু সভ্যতার নিয়ম এমনই যে যক্ষপুরীর ইট, কাঠ, লোহা ও সম্পদের কাছে জীবনের প্রেম-সৌন্দর্য, প্রকৃতির রঙ, রস, রূপ ও ছন্দ ক্রমে বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে শোষক ও শোষিতের সম্পর্কই হয়ে উঠেছে মূল কথা।

কিন্তু কবি মনে করেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হওয়া উচিত আন্তরিকতার, প্রাণের সম্পর্ক। প্রকৃতির সঙ্গে সহজ সম্পর্কেই গড়ে উঠতে পারে এই সম্পর্ক। তেমনি প্রকৃতির দান যে সম্পদ সেই সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনেই তা সম্ভব হতে পারে। এই নাটকের মধ্যে কবি পুঁজিবাদী সভ্যতার যন্ত্রসর্বস্ব জড় শক্তির সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত কৃষিজীবী সভতার প্রাণশক্তির বিরোধকে তুলে ধরেছেন। রাজা এবং তার পার্ষদ যদি হয় সেই জড় শক্তির প্রতীক তবে নন্দিনী-রঞ্জন-বিশু এরা প্রাণশক্তির প্রতীক। শেষ পর্যন্ত প্রাণের কাছে জড়ের পরাজয় হয়েছে। যন্ত্রের হাতে বন্দি রাজা শেষ পর্যন্ত তার জালের আবরণ ছিঁড়ে মুক্তির সংগ্রামে এগিয়েছে। এটিও সভ্যতার স্বাভাবিক নিয়ম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় - "আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।"('কবির অভিভাষণ')। ধনতন্ত্রের মধ্যেই যে তার পতনের বীজ লুকিয়ে আছে - এই ঐতিহাসিক সত্য নাটকটির শেষে প্রতিফলিত হয়েছে।

১০.২। রক্তকরবী নাটকের সমাজ বাস্তবতা প্রসঙ্গ

'রক্তকরবী'-র দেশ কাল-পটভূমির আলোচনার আমরা দেখেছি সমকালীন পশ্চিমি দেশগুলিতে শিল্পায়নের অগ্রগতির চিত্র যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার ক্রম আগ্রাসন ও পুঁজিবাদের নগ্ন রূপ কৃষি নির্ভর সমাজ ও সভ্যতাকে যেভাবে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল তার

বিরুদ্ধেই কবি শৈল্পিক প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই নাটকের মধ্যে দিয়ে। ফলে যক্ষপুরীর রূপকে এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে পুঁজিবাদী শোষণের নগ্ন রূপটি।

যক্ষপুরীকে এখানে আমরা একটি আধুনিক ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্পকেন্দ্র ভাবতে পারি। ইন্ডাস্ট্রি যেমন চারিদিকে শক্ত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকে, যক্ষপুরীও তাই। সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে সোনার খনি। রাজা তার মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে সোনার খনি থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চান। একটা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠে নানান প্রশাসনিক স্তরের সুষ্ঠ বিন্যাসে। যক্ষপুরীতে রাজা তেমনি তৈরি করেছে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা। রাজা আছেন সবার উপরে। তার পরে আছে বড়ো সর্দার, মেজো সর্দার, ছোটো সর্দার, মোড়ল প্রভৃতি নানান প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি। ঠিক অনেকটা ডিরেক্টর -ম্যানেজার -সুপারভাইজারদের মতোই। তাদের কাজ যক্ষপুরীর খনি-শিল্পকে ঠিকমতো চালনা করা। এর জন্য তারা নানান কৌশল অবলম্বন করেন। যেহেতু তাদের লক্ষ্য শ্রমিক-সাধারণকে শোষণ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন, তাই শোষণব্যবস্থার নানান সূক্ষ্ম কৌশল গ্রহণে তারা তৎপর।

তাঁদের মুনাফা অর্জনের প্রধান অবলম্বন শ্রমিকশ্রেণি অর্থাৎ যক্ষপুরীর কারিগররা। যক্ষপুরীর খনিতে কাজ করানোর জন্য তাদের আশেপাশের নানান গ্রাম-গঞ্জ থেকে টাকার লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু যক্ষপুরীর মালিক শ্রেণির চোখে সেই খোদাইকররা কেউ মানুষ নয় - সংখ্যা মাত্র। যেমন আছে ৪৭ফ, ৬৯ঙ, ৭১ট প্রভৃতি । সংখ্যা দিয়েই তাদের পরিচয়। তাদের ডিউটি আওয়ারস্ বারো ঘণ্টা এবং বারো ঘণ্টা ডিউটির পরেও অন্তত চার ঘণ্টা ওভার টাইম দিতে হয়। এই রুটিন-মাফিক ঠাসা কাজের থেকে ছুটি নেওয়ার অধিকারও শ্রমিকদের নেই, নেই বাড়ি যাওয়ার হুকুম।

ক্রমাগত শোষণে অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে শ্রমিকদের অসন্তোষের বাষ্প যাতে বিদ্রোহের, বিপ্লবের রুপ না নেয়, তার জন্য ব্যবস্থা করেছে যক্ষপুরীর রাজা। শ্রমিকদের জন্যেও আছে কোয়ার্টার্স। সিনিয়ারিটি ও আনুগত্য অনুসারে সেই কোয়ার্টারস্ও বিভিন্ন টাইপের ন, ঞ, চ, ণ পাড়া প্রভৃতি। মালিকরা শ্রমিকদের-জন্য যেমন হেলথ সেন্টার, স্কুল-টুল তৈরি করে - যক্ষপুরীর খোদাইকরদের জন্যেও সে ব্যবস্থা আছে। তাই এসেছে চিকিৎসক ও অধ্যাপক। অবশ্য রাজার উদ্দেশ্য এখানে ভিন্ন। শোষিত কারিগরদের মধ্যে অসন্তোষ

যাতে দানা না বাঁধতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই চিকিৎসক ও অধ্যাপক নিয়োগ। ধর্মকথায় তাদের ভুলিয়ে রাখার জন্য মালিকপক্ষ মন্দিরের ব্যবস্থাও রেখেছেন। তাদের ধর্মকথা শোনানোর জন্য গোঁসাই, পুরাণবাগীশরাও আছেন। আর এতেও যারা ভোলে না, তাদের ভুলিয়ে রাখার জন্য মদের ভাটিখানাও আছে। ফাগুলালের মতো খোদাইকর মদের নেশাতেই তার সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলতে চেয়েছে। এত কিছুর পরেও শ্রমিকদের মধ্যে কোনোরকম অসন্তোষ দানা বাঁধছে কিনা তা জানার জন্য রাজা চর বা স্পাই -এর ব্যবস্থাও রেখেছেন। স্পাই -৩২১ তেমনই চরিত্র।

যক্ষপুরীর জীবন ও সমাজ স্বাভাবিকভাবেই হয়ে ওঠে সমাজ বাস্তবতার চিরকালীন ছবি। প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্র এবং শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মতোই ষক্ষপুরীর রাজা ও খোদাইকরদের মধ্যে লড়াই চলে। অবশ্য 'রক্তকরবী'- তে এই বাস্তবতা এসেছে শিল্পের আবরণে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের বাস্তবতাকে শিল্পের বাস্তবতা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখেছিলেন। তাই এই নাটকে সমাজ বাস্তবতাকে খুঁজে পাই একটু স্বতন্ত্রভাবে শিল্পের আবরণে।

নাটকটিতে রাজার যে জালের আবরণ তা পুঁজিবাদী শাসকের জন-সংযোগ থেকে দূরে থেকে শোষণের একটি কৌশল হতে পারে। এবং তার পার্ষদবর্গকে নিয়ে গঠিত মেশিনারি সেই সিস্টেমটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার নির্মমতা মানুষকে জনবিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাকে করে তোলে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন সত্তা। যক্ষপুরীর প্রতিটি মানুষই সেই বিচ্ছিন্নতার শিকার। যক্ষপুরীর সোনার তলায় চাপা পড়ে গেছে তাদের ব্যক্তিস্বরূপ।

ঠিক এমনই এক পরিবেশে প্রাণচঞ্চল, পূর্ণব্যক্তিত্ব নন্দিনী আসে। তারই সংস্পর্শে যক্ষপুরীর মানুষগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে অন্তদ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব জনিত সংকটের চাপেই পুঁজিবাদী শাসনের মেশিনারিতে ফাটল ধরে। খোদাইকরেরা ক্রমশ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। রঞ্জন হয়ে ওঠে তাদের মধ্যেকার বিপ্লবের চেতনা । বিশু যেন রঞ্জনের নির্দেশেই সংগঠন গড়ে তোলে এবং বিপ্লবী নেতা হয়ে ওঠে। অন্যদিকে রাজার মধ্যেও শুরু হয় অন্তদ্বন্দ্ব। বিশেষ করে যখন রাজা বুঝতে পারে তারই তৈরি মেশিনারির হাতে সে আজ বন্দি। সর্দারতন্ত্র অনেকটা আমলাতন্ত্রের মতোই। রাজাকে হাতের পুতুল করে তার

মেশিনারি ভাঙার জন্য। ধনতন্ত্রের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পতনের বীজ। এই নাটকে রাজা শেষ-পর্যন্ত তার জালের আবরণ ছিড়ে ফেলে শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে হাত মিলিয়ে শেষ লড়াইয়ে এগিয়েছে। এও এক রাষ্ট্রবিপ্রব। শ্রেণিসংগ্রামের বস্তুবাদী তত্ত্বকে মেলানো যায় 'রক্তকরবী'-র সঙ্গে। এই কারণেই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এই নাটকে। বিশেষ করে আজকের সময়েও, নেপালের রাজতন্ত্রের অবসানেই হোক বা বাংলাদেশের জনজাগরণে।

১০.৩। রক্তকরবী নাটকে পুঁজিবাদী শোষণের রূপ চিত্র

'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শোষণের স্বরূপটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যক্ষপুরীর সোনার খনি থেকে তাল তাল সোনা উৎপাদন ও মুনাফা অর্জনের মধ্যে দিয়ে ক্যাপিটালিস্ট শাসনের ও শোষণের মেশিনারি গড়ে উঠেছে। শোষণের নানান কৌশল এবং দমননীতির নানান উপায় ক্যাপিটালিজমের চেহারাটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

খোদাইকররা এখানে উৎপাদনের প্রধান কারিগর। পুঁজিবাদী সমাজে তাদের শ্রমশক্তিকে নামমাত্র মূল্যে কিনে নেয় মালিক শ্রেণি। বলা ভাল তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। বারো ঘণ্টার উপরে আরো চার ঘণ্টা ওভার টাইম দিয়ে তারা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। মালিক শ্রেণি অপরিমিত মুনাফা সঞ্চয় করে। কিন্তু এই অতিরিক্ত শ্রমের জন্য কারিগরদের বাড়তি সুবিধা দিতে হয় না। অথচ সামান্য পয়সার বিনিময়ে ষোলো ঘণ্টার হাড়-ভাঙা খাটুনির পরেও শ্রমিকদের জন্য থাকে শুধুই শোষণ ও বঞ্চনা। উৎপাদিত পণ্য থেকে তারা যেমন বিযুক্ত হয়ে পড়ে, তেমনি মালিক শ্রেণি অপরিমিত ধন সঞ্চয় করে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ধনের অসাম্য।

অন্যদিকে শ্রম দিতে দিতে একসময় শ্রমিকদের জীবনটাই হয়ে পড়ে গৌণ। প্রকৃতি থেকে তো বটেই এমনকী বৃহত্তর সমাজ ও মানুষের থেকেও তারা বিযুক্ত হয়ে, এক একজন বিচ্ছিন খণ্ড মানুষে পরিণত হয়। পুঁজিবাদী শোষণের এমনই চরম পরিণতি যক্ষপুরীর কারিগরদের দশপঁচিশের ছকে পরিণত করে। অবশ্য এর জন্য শুধু কারিগরদের শ্রমশক্তিকে শোষণ করছে তাইই নয়, মানসিক এবং শারীরিকভাবে

শোষণের ব্যবস্থাও যক্ষপুরীতে আছে। আর তাই অধ্যাপক আছে কারিগরদের বুদ্ধি ও চেতনাকে বিপথে চালনা করবার জন্যে। গোঁসাই আছে ধর্মকথায় তাদের বঞ্চনা ও অত্যাচারকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য । এছাড়াও আছে মদের ভাটিখানা, শ্রমিকদের সব জলা থেকে ভুলে থাকবার সুধা।

পুঁজিবাদী সমাজ শ্রমিকের শ্রম ছাড়া আর কিছুই চায় না। শ্রমশক্তিহীন শ্রমিকের প্রয়োজন তাদের নেই। যক্ষপুরীর সোনার খনিতে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে যে শ্রমিকরা শ্রমশক্তি হারিয়েছে, তারা হয়ে ওঠে 'রাজার এঁটো'। পুঁজিবাদী শোষণ এদেরকে ছিবরে আখে পরিণত করেছে। নন্দিনীর ভাষায় বলতে গেলে - "ওরা কি মানুষ! ওদের মধ্যে মাস-মজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে!"অথবা- "লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মর্চেটাই বাকি!" রাজার খিড়কির দরজা দিয়ে তাদের প্রস্থান ঘটে, যেহেতু শ্রমশক্তিহারানো এই সব প্রেতছায়াদের কোনো প্রয়োজন পুঁজিবাদী সমাজের নেই।

এত কিছুর পরেও ক্রমাগত শোষণ ও বঞ্চনা কখনো কখনো মানুষের প্রতিবাদী চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে। এই নাটকে তেমনই প্রতিবাদী চরিত্র গজ্জু পালোয়ান এবং বিশু পাগল। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতে হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়ে উঠতে দ্বিধা করে না। গজ্জুর মতো প্রতিবাদী ও বিদ্রোহীদের তাই মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়। শারীরিকভাবে তো বটেই মানসিক ভাবেও তাদের নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। পালোয়ানের ভাষায়- "বোধ হচ্ছে, ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়!" রঞ্জনের মতো প্রতিবাদী চেতনাকে হত্যা করতেও রাজার বাধেনি। শ্রমিকের জোট বাঁধা সংহতিকে ভেঙে ফেলার জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্র চূড়ান্ত দমননীতির আশ্রয় নেয়। পুলিশবাহিনী ও সেনাবাহিনীকে তারা কাজে লাগায় বিদ্রোহ দমনের জন্য। নাটকের শেষে সর্দার তাই সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসে বিদ্রোহ-মোকাবিলায়।

১০.৪। রক্তকরবী নাটকের কেন্দ্রীয় সংঘাত প্রসঙ্গ

'রক্তকরবী' নাটকটিতে নানান ধরনের সংঘাত লক্ষ করা যায়। সংঘাত খোদাইকরদের সঙ্গে সর্দারতন্ত্রের। সংঘাত রাজার মুখোশের সঙ্গে অন্তরের মানুষটির। সংঘাত বাইরের মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে যক্ষপুরীর বদ্ধ পরিবেশের সংঘাত নন্দিনীর সঙ্গে সর্দারের। এমনতরো হাজারো সংঘাতের ইঙ্গিত এই নাটকে আছে। কিন্তু নানান সংঘাতের মধ্যে নাটকের কেন্দ্রীয় সংঘাতটিকে চিনে নিতে পাঠকের খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা না।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই কেন্দ্রীয় সংঘাতটির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন ১৩৩০-এ লেখা একটি অভিভাষণে- "কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই-জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম ছন্দ আছে।" 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে স্পষ্টতই কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার সংঘাত লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন- "কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। বলা বাহুল্য কর্ষণ-আকর্ষণজীবীর অসম দ্বন্দ্বে কৃষিপল্লি ধ্বংস হয়ে চলেছে। আকর্ষণজীবী পুঁজিবাদী সমাজ কেবলই মুনাফার লোভে কৃষকদের শ্রমিকে পরিণত করছে, একালের এই ঐতিহাসিক সত্যটুকু রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন- "শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বেষ হিংসা বিলাস বিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মত" বস্তত রক্তকরবী নাটকের কেন্দ্রীয় সংঘাতটি মূলত দুই শক্তির। একদিকে আছে ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্যপরম্পরার কৃষিজীবী সভ্যতা । অন্যদিকে আছে আধুনিক শিল্পোন্নত পশ্চিমী পুঁজিবাদী সভ্যতা যারা মুনাফার লোভে কৃষিজীবী সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাই এই দ্বন্দ্ব শুভবোধের সঙ্গে অশুভ শক্তির, ন্যায়বোধের সঙ্গে অন্যায়ের, গ্রামীণ পল্লিসভ্যতার সঙ্গে নগরজীবনের। এই নাটকে যক্ষপুরী সেই আকর্ষণজীবী পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রতিনিধি। সেখানে সোনার খনি থেকে তাল তাল সোনা হরণ করে আনছে রাজা ও সর্দাররা। সেখানে শুধুই মরা সম্পদের স্তূপ। যক্ষপুরী তাই গ্রহণ-লাগা পুরী। তার আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে যায় মানুষের সমস্ত প্রাণশক্তি।

'রক্তকরবী'-র এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে আছে কর্ষণজীবী কৃষিভিত্তিক পল্লিভিত্তিক সভ্যতার আহ্বান। তাই মকররাজের বিপরীতে বিরোধী শক্তিরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে

কৃষিভিত্তিক সভ্যতার প্রতিভূ নন্দিনীকে। নন্দিনীর পরনে ধানী রঙের শাড়ি তারই ইঙ্গিত দেয়। নাটকের শুরুতে যক্ষপুরীর প্রাচীর ঘেরা আবদ্ধ জীবনের বাইরে দূর থেকে ভেসে আসে পৌষের গানের সুর। সেই গানের সুরে ভেসে আসে প্রকৃতির আহ্বান, কৃষিসমাজের তথা লোকজীবনের আহ্বান। সমগ্র নাট্যশরীরে ছড়িয়ে আছে সেই সুর। নাটকটির মধ্যে যক্ষপুরীর প্রতিস্পর্ধী সভ্যতারূপে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সঙ্গে সংঘাতের পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। রঞ্জনের মাদলের উল্লেখে, কোদালের তালে তালে, নবান্নের উৎসবে, নীলকণ্ঠ পাখির কথায় প্রতিস্পর্ধী সেই লোকজীবনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সব মিলিয়ে এই নাটকের কেন্দ্রীয় সংঘাতরূপে জড় বনাম প্রাণ, অশুভ শক্তি বনাম শুভ শক্তি, নগর সভ্যতা বনাম কৃষিজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্বকেই তুলে ধরা হয়েছে।

১০.৫। রক্তকরবী নাটকে পুরাণ ভাবনা

'রক্তকরবী' নাটকে পুরাণের একটি আবহ নির্মিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে নাটক না বলে 'পালা' বলেছেন এবং পুরাণের সঙ্গে মিলিয়ে এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। নাট্যঘটনা যে শহরকে কেন্দ্র করে ঘটেছে তার নাম যক্ষপুরী। যদিও নাটকটিতে যক্ষপুরীর সঙ্গে অনেকটা মিল পাওয়া যাবে আধুনিক সময়ের কোনো শিল্প-নগরীর তবু এই স্থানটির ভৌগোলিক গঠন এবং সমাজ-বিন্যাসে পুরাণের ছোঁয়া নিবিড়ভাবেই আছে।

যক্ষপুরী পুরাণ অনুসারে যক্ষরাজের পুরী। 'রক্তকরবী'-র রাজাকে কখনো যক্ষরাজ, কখনো মকররাজ কখনো কুবের বলা হয়েছে। যক্ষ হল ধনের দেবতা। প্রজা সৃষ্টি-কালে ব্রহ্মা অতিশয় ক্ষুধার্ত হয়ে অনুকারেহ প্রজা সৃষ্টি করতে থাকেন। ফলে কিছু বিকৃত প্রজা সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে ক্ষুধার্ত হয়ে ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করতে উদ্যত হল কিছু প্রজা। এরাই হল যক্ষ। অবশ্য যক্ষ নিয়ে আদিম একটি লোকবিশ্বাস জড়িয়ে আছে। কোনো ধনবান কৃপণ ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তার ধনরত্ন সুরক্ষিত রাখার জন্য মাটির নিচে ঘর করে একটি বালককে পুজা দিয়ে ধনরত্নসহ বন্ধ করে রাখত। সেই বালক অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে যক্ষযোনি হয়ে সেই ধন রক্ষা করত।

ঠিক এই বিশ্বাস থেকেই এসেছে পাতালপুরীর কথা। যক্ষপুরীর বিকৃত অন্ধকারে ক্ষধার্ত-গ্রাস সেই আবহই তৈরি করেছে। এই পাতালপুরীর রাজা যক্ষরাজ, যার আর এক নাম কুবের, "যিনি সমস্ত ধনের প্রদাতা ও অধ্যক্ষ, তিনি যক্ষ ও কিন্নরগণের অধিপতি ...।" (পৌরাণিক অভিধান) নাটকে তাকে মকররাজ বলা হয়েছে। মকর অর্থাৎ মীন বা হাঙ্গর। মকর হলেন গঙ্গার বাহন। বিশুর ভাষায় 'মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে।' বলা বাহুল্য মকররাজকে হাঙ্গর বা কুমিরের মতো নিষ্ঠুর দেখাতেই এই তুলনা কর হয়েছে।

একইভাবে নাটকে এসেছে মরা ধনের শব সাধনার কথা । তান্ত্রিক আচার পদ্ধতির এই সাধনা করেন কোনো মহাবলশালী, মহাসাহসিক মানুষ । রাজার ধনসঞ্চয় পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যকে সহজেই এই শব সাধনার সঙ্গে তুলনা করা চলে। নাটকে যক্ষপুরীকে 'গ্রহণ লাগা পুরী' বলা হয়েছে। গ্রহণ লাগার অনুষঙ্গটি পুরাণে খণ্ডিতমস্তক-রাহুর চন্দ্রভক্ষণ প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ সেই প্রবল ক্ষুধা এবং জোরের আবহই নির্মিত হয়েছে এখানে এইভাবে নাটকে এসেছে একের পর এক পৌরাণিক অনুষঙ্গ। কখনো তাল-বেতালের কথা। রাজা বিক্রমাদিত্য যাদের বশ করেছিলেন। কখনো এসেছে প্রেত, কানা-রাক্ষসের অভিশাপের কথা। যক্ষপুরীর আলোহীন আশাহীন পরিবেশে নিঠুরতা, ক্ষুধার্তের আগ্রাসন এবং যুগান্তব্যাপী অন্ধকারের আবহ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে এই সমস্ত পৌরাণিক অনুষঙ্গগুলি।

তবে মনে রাখা দরকার নাটকটিতে পৌরাণিক অনুষঙ্গ থাকলেও এটি কোনোমতেই পৌরাণিক নাটক নয়, পৌরাণিককালের কাহিনি নিয়েও লেখা নয়। বরং রাজা-সর্দার-মোড়ল-সৈন্যসামন্ত নিয়ে গড়া যক্ষপুরীর সামাজিক কাঠামোকে অনেকটা ফিউডাল সমাজব্যবস্থা বলা যায়। অবশ্য ফিউডাল সমাজের উপরি কাঠামোয় পুঁজিবাদী সভ্যতার শোষণ ও ধনসঞ্চয়ের স্বরূপটিই কবির মূল অভিপ্রেত। কাজেই বলা যেতে পারে পুরাণ প্রসঙ্গ বা পৌরাণিক আবহেই রামায়ণের ব্যাখ্যা কবি দিয়েছেন নাটকের প্রস্তাবনায়। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে পুরাণ প্রসঙ্গগুলি নাটকে আবহমান-কালের চলমানতাকে

ফুটিয়েছে। আধুনিক সময়ের সীমানাকে ছুঁয়েও তা বিশেষ দেশে বিশেষ কালে সীমাবদ্ধ হয়নি। পুরাণের প্রয়োগ তাই এর শিল্পরূপকেই শক্তিশালী করে তুলেছে।

১০.৬। রক্তকরবী নাটকের চরিত্র চিত্রণ

'রক্তকরবী'-র চরিত্রশালায় প্রবেশ করলে সাধারণত দুই শ্রেণির চরিত্র চোখে পড়ে। এক.শোষক শ্রেণি অর্থাৎ যারা যক্ষপুরীর প্রশাসন চালনা করছে। সবার উপরে আছে রাজা। এছাড়া সর্দাররা, মোড়ল, অধ্যাপক, প্রভৃতি। রঞ্জনকে এক্ষেত্রে একটু স্বতন্ত্র হিসেবেই দেখা উচিত। অবশ্য সেও কারিগর শ্রেণিরই প্রতিনিধিত্ব করেছে।

‘রক্তকরবী’-র চরিত্র বিচারে শ্রেণি প্রতিনিধিত্বের কথাটিকে মাথায় রাখতে হবে। তবে আমরা এই আলোচনায় রক্তকরবীর চরিত্রশালাকে প্রধান এবং অপ্রধান এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করছি। কাহিনিতে চরিত্রের ভূমিকা এবং প্রাধান্যের বিচারে প্রধান চরিত্রগুলি হল - রাজা, নন্দিনী, বিশু এবং রঞ্জন। আর অপ্রধান চরিত্র হিসেবে - কিশোর, অধ্যাপক, সর্দার, পুরাণবাগীশ, চিকিৎসক, গোকুল এবং মোড়লের নাম উল্লেখ করতে হয়।

রাজা

রক্তকরবী’-র প্রধান চরিত্র রাজা। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের রাজা চরিত্রের থেকে ‘রক্তকরবী’র রাজা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চরিত্রটিকে মঞ্চে একটি জালের অন্তরাল থেকে কথা বলতে শোনা যায়। প্রথমাবধি অন্তরালে থাকলেও নাটকের শেষে রাজাকে তার জালের আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে দেখি। রাজা এই নাটকে একজন রক্তমাংসের মানুষ। যে যক্ষপুরীতে মকররাজ নামে পরিচিত। যক্ষপুরীর সর্দার-মোড়লদের নিয়ে যে বিশীল প্রশাসন-ব্যবস্থা, তা তৈরি করেছে রাজাই এবং এই মেসিনারির প্রধান হিসেবে রাজাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে একটি মিথ। অনুমান করা যেতে পারে রাজাকে ঘিরে তাই যে মিথ তৈরি হয়েছে, তা যন্ত্রসভ্যতা বা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অকল্পনীয় ক্ষমতা ও নিষ্ঠুরতাকে বোঝাতেই। রাজা সম্পর্কে এই অধ্যাপককে বলতে শুনি- “আমাদের মরাধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।”

রাজার প্রথম আবির্ভাবে নন্দিনীর সঙ্গে কথোপকথনে রাজার সেই বিশালত্বের বোধ এবং বিশালত্বসঞ্জাত কান্তির কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। কখনো রাজা নিজেকে পর্বতের চুড়ার মতোই, মধ্যাহ্ন সূর্যের মতোই নি:সঙ্গ বলেছে। বলেছে, সে যেন এক প্রকাণ্ড মরুভূমি যে তৃষ্ণার দাহে কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে। এই বিশাল ও নিসঙ্গতার পাশাপাশি আছে নন্দিনীর মতো মুক্ত প্রানের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং রঞ্জনের মতো প্রবল যৌবনের প্রতি স্বাভাবিক ঈর্ষা।

এই ঈর্ষাবোধ এবং নিজের পৌঢ়ত্বজনিত বিশালতা ও তৎজনিত ক্লান্তিবোধ রাজাকে অসুখী করে তোলে। শক্তির ভারে নুব্জ, রাজার সঞ্চয়ের ভাণ্ডার উপ্চে পড়লেও মহাবিশ্বের বাঁশিতে বেজে ওঠা সহজ ছন্দের প্রতিভূ নন্দিনীকে সে ছুঁতে পারে না। তাকে পেতে গেলে জালের ভিতর থেকে নয়, পরিপূর্ণভাবে বাইরে আসতে হয়। আর তা পারে না বলেই রাজা জোর করে তা ছিনিয়ে নিতে চায়। এখানে আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয় - নন্দিনী রাজার ঘরে ঢুকতে চাইলে রাজা প্রথমেই 'সময় নেই, একটুও না' -একথা বললেও কথোপকথনের শেষ দিকে- 'এখনো সময় হয়নি' - বলেছে। এর ফলে সময় হবে এমনই এক সম্ভাব্যতা তৈরি হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বারের কথোপকথনে রাজাকে দেখা যায় অনেক বেশি অস্থির-চিত্ত এবং কিছুটা ক্রুদ্ধ-আক্রমণমুখী। নন্দিনীর সঙ্গে বিশুকে দেখে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, তাকে নন্দিনীর সঙ্গ ছাড়া করার হুমকি দেখায়। তাছাড়া এই সময়ে রাজার মধ্যে অন্য একটি ইচ্ছেও জেগে উঠতে দেখি। তা হল রাজার অন্তর্গত মানুষটির মৃত্যুর ইচ্ছে। নন্দিনীর চুলে হাত ডুবিয়ে বসে রাজা মৃত্যুর আরাম পেয়েছিল। মিথ্যে বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার থেকে রাজা মৃত্যুর অভিলাষ প্রকাশ করে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে এখানে রাজার মধ্যে তীব্র এক দোলাচলতায় চরিত্রটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

এই দোলাচলতার আরও পরিচয় সর্দার-চিকিৎসক কথোপকথনে পেয়েছি। যেখানে রাজার মানসিক অস্থিরতা এতটাই যে তার প্রবল ধাক্কায় বড়ো বড়ো থাম হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যায়ে সংশয়ে দীর্ণ রাজা তার অবসাদের ক্লান্তি ঘুচিয়ে নিতে চেয়েছে ধ্বজা পূজা করে। ঠিক তখনই নন্দিনীর 'তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি' এই উক্তি রাজার

মধ্যে সমস্ত হিংস্রতাকে জাগিয়ে দেয়। রাজা ভেঙে ফেলে তার জালের দরজা। পরমুহূর্তেই রঞ্জন ও কিশোরের মৃতদেহ রাজার চোখ খুলে দেয়। সে বুঝতে পারে যে সর্দার তাকে ঠকিয়েছে, তার নিজের যন্ত্র তাকে মানছে না। এই উপলব্ধিই রাজাকে এগিয়ে দেয় তারই মেশিনারিকে ধ্বংস করার দিকে। নাটকের শেব দিকে তাই রাজা নন্দিনীর পিছনে পিছনে এগিয়ে যায় শেষ লড়াইয়ে । রবীন্দ্রনাথ এই নাটক সম্পর্কে 'কবির অভিভাষণ'-এ বলেছেন - "আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।" ধনতন্ত্রের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার ধ্বংসের বীজ। রাজার উপলব্ধি এবং নিজেরই বন্দিশালা ভাঙতে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে সেই ঐতিহাসিক সত্যটিই প্রতিফলিত হয়েছে। চরিত্র হিসেবে রাজা দোষে-গুণে, বিশালতায়-দুর্বলতায় সার্থক মানব চরিত্রও হয়ে উঠেছে।

নন্দিনী

'রক্তকরবী' নাটকের প্রাণকেন্দ্রে আছে নন্দিনী। রবীন্দ্রনাথকে এই চরিত্রটি সম্পর্কে বলতে হয়েছে- "রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে এক মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।" রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রটি সম্পর্কে 'মানবী' পরিচিতিটুকু ছাড়াও 'সহজ সুখের' 'সহজ সৌন্দর্যে'-প্রভতি কথাগুলিও বলেছেন। বস্তুত যক্ষপুরীর যন্ত্রসর্বস্ব জটিল ও বিচ্ছিন্ন জীবনের বিপরীতে নন্দিনীকে সহজ সৌন্দর্যের এক পূর্ণ মানবী করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

নাটকের প্রথম দিকে চরিত্রটি অনেক বেশি সরল। কিন্তু সে প্রাণবন্ত, 'নন্দিনী'-এই নামটির মতোই উচ্ছল। এ হেন পূর্ণমানবী প্রাণোচ্ছল নন্দিনীকে দেখে যক্ষপুরীর প্রতিটি মানুষই প্রভাবিত হয়। কিশোর তার নাম ধরে বার বার ডাকে। অধ্যাপক তাকে তত্ত্বকথা বোঝাতে চায়। ফাগুলাল নন্দিনীকে দেখে নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পায়। নন্দিনীর সাহচর্য রাজাকে বিচলিত করে। তাকে অকাজের কাজে নিয়ে এলেও রাজার ভিতরকার মানুষটি ক্রমশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে গোকুল বা চন্দ্রার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হয় ঠিক বিপরীত। নন্দিনী তাদের চোখে 'ভয়ংকরী' অথবা 'রাক্ষুসী'।

যাইহোক নন্দিনীকে এই নাটকে যে বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে সেকথা স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রশ্ন হল যক্ষপুরীর আবদ্ধ পরিবেশে নন্দিনীর যেরকম ভূমিকা তাতে কেউ কেউ চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথের 'আইডিয়া'র বাহন হিসেবেই দেখেতে চেয়েছেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা চরিত্রটির একটি পূর্বপরিচয় রয়েছে যা তাকে ব্যক্তি মানুষ বা সামাজিক মানুষ হিসেবে চেনায়। তার ঘর ছিল ঈশানী পাড়ায়। তাকে ঘিরে একসময় বিশু-রঞ্জনদের মধ্যে চলেছিল বাজি খেলা। সে খেলায় রঞ্জন তাকে জিতে নিয়েছে। নাটকে সে রঞ্জনেরই স্ত্রী। যক্ষপুরীতে সে রঞ্জনের আগমনের প্রতীক্ষা করেছে।

তাছাড়া চরিত্রটির ক্রমবিবর্তনও দেখা যায়। প্রথমদিকের সহজ সরল প্রাণোচ্ছল নন্দিনীই যখন রাজার এঁটোদের দেখেছে, দেখেছে যক্ষপুরীর ঐশ্বর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নিষ্ঠুর নগ্নতা তখনই সে আঘাতে আঘাতে ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। তাই তৃতীয় সাক্ষাতে রাজার জানলায় নন্দিনী ঘা দিতে থাকে। রঞ্জনকে সর্দার নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করতে দেবে না বললে নন্দিনী সরাসরি তাকে চ্যালেঞ্জ করে - "দেখব তোমার সাধ্য কীসের" । এমনকি রাজা যখন তাকে বলে "আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না", তখন নন্দিনী তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে - "তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।" নন্দিনীই এগিয়ে গেছে শেষ লড়াইয়ে সর্দারদের বিরুদ্ধে। রাজা গেছে তার পিছনে। রবীন্দ্রনাথ নারীশক্তির প্রবর্তনায় পুরুষের মধ্যে উদ্যম সঞ্চারের কথা বলেছেন। এই নাটকে নন্দিনীর ভূমিকা অনেকটা তাই। সে 'ব্যক্তিমানুষ', সে 'মানবী' এই সমস্ত কথা বলেও 'রক্তকরবী'-তে নন্দিনী যে নিতান্ত মানবীর বেশি কিছু তা স্বীকার করতেই হয়।

বিশু

'রক্তকরবী' নাটকের আর একটি প্রধান চরিত্র বিশু। বিশুকে সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের ঠাকুর, ঠাকুরদা বা ধনঞ্জয় বৈরাগী - প্রভৃতি চরিত্রের স্বগোত্রীয় মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই চরিত্রটি সেই শ্রেণির নয়। 'রক্তকরবী'-তে বিশু সব থেকে বেশি বিবর্তিত চরিত্র এবং নিঃসংশয়ভাবে মানবচরিত্র। নন্দিনীর মতো তারও একটা অতীত রয়েছে। নন্দিনীর পাশের গ্রামেই তার ঘর। নন্দিনীকে পাওয়ার জন্য রঞ্জণ

এবং আরও অনেকের সঙ্গে বিশুও বাজি খেলায় মেতে ছিল। কিন্তু সেই বাজি খেলায় বিশু হেরে গিয়ে প্রায় জীবনের স্বাভাবিক পথ থেকেই ছিটকে গেছে। নন্দিনীকে ভুলতে অন্য এক নারীকে সে বিয়ে করে। তারপর সেই স্ত্রীর দাবি মেটাতে একসময় সে চলে আসে যক্ষপুরীতে চর-এর কাজ নিয়ে। কিন্তু সে কাজে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারায় তার ডিমোশান হয়। অবশেষে খোদাইকরদের সঙ্গে সে কোদাল ধরে। আর সেই লজ্জায় তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে। তারপর যক্ষপুরীর কবলে ঢুকে শেষ পর্যন্ত তার 'আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে' বিশুকে তলিয়ে যেতে দেখি।

বিশুর এই ব্যর্থ প্রেমিক জীবনের অন্যপিঠে আছে আর একটি পরিচয়। সেখানে সে শ্রমিক নেতা, বিপ্লবকর্মী। এক সময়ে সে ছিল বিদ্বান, অনেক পুথিপড়া লোক। শিক্ষিত বলে খোদাইকরদের মধ্যে তার স্বতন্ত্র সম্মানও আছে। তার কথাবার্তাকে চন্দ্রা ফাগুলালরা ধরতে পারে না। জ্ঞান-অভিজ্ঞতা এবং আত্মমর্যাদা চরিত্রটিকে ভবিষ্যতে পরিণতবুদ্ধি একজন বিশিষ্ট নেতা করে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। আর নাটকেও তাই দেখি প্রথমদিকে চরিত্রটি নিতান্তই সাধারণ। ব্যক্তিজীবনে প্রেমের প্রতিযোগিতার মতো সে বৃহত্তর জীবনেও একজন দুঃখী ও পরাজিত মানুষ। অথচ নাটকের মাঝামাঝি সময় থেকে নন্দিনীর সাহচর্যে সে ক্রমশ সাহসী ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। নন্দিনীকে পেয়ে সে নিজের মধ্যে আলো দেখতে পায়। এমনকী সে যক্ষপুরীর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে- "..কিন্তু পাগলি, তোর সামনে মনটা স্পর্ধিত হয়ে ওঠে, সাবধান হতে ঘৃণা বোধ হয়।"

বস্তুত নন্দিনীর সাহচর্য ও তার ভালোবাসাই বিশুর মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দেয়। নাটকের শেষদিকে বন্দি অবস্থায় কিশোরকে তার নির্দেশ - "রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে।" কিংবা বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে আসার পর, নাটকের শেষে বিশুর - "আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল" বলার ভঙ্গি চরিত্রটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। সুতরাং পরাজিত প্রেমিক থেকে বিদ্রোহী শ্রমিক নেতায় উত্তরণের যে গ্রাফ এই নাটকে আমরা দেখি, তাতে বিশু চরিত্রটিকে সার্থক প্রধান চরিত্রের মর্যাদা দিতেই হয়।

রঞ্জন

'রক্তকরবী'-র সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সব থেকে বিতর্কিত চরিত্র রঞ্জন। সমগ্র নাটকে চরিত্রটি থেকে যায় নেপথ্যে নাটকের শেষে সে মঞ্চে এসেছে, তবে মৃতদেহ রূপে। বাস্তবিকই চরিত্রটি কিছুটা রহস্যময় অন্যান্য চরিত্রের কথোপকথনে সে কথাই উঠে এসেছে। সমালোচকদের চোখে তাই চরিত্রটি সাংকেতিক অথবা আইডিয়ার বাহন - রক্তমাংসের মানব সে নয়।

কিন্তু এইভাবে একতরফা দেখাটা চরিত্রটির প্রতি অবিচার। অন্যান্য চরিত্রের মতো রঞ্জন চরিত্রটিরও একটি অতীত এ নাটকে আছে। নন্দিনী তার সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছে তাতে জানতে পারি রঞ্জনের মধ্যে আছে এক প্রবলতা। প্রচণ্ড শক্তিতে, কামনার উদ্দীপনায় সে নন্দিনীকে ভাসিয়ে দেয়। ভালোবাসার প্রবল আবেগে সে নন্দিনীকে অনায়াসে জিতে নেয়। তার তীব্র যৌবন এবং জীবনাবেগ যক্ষপুরীর আবদ্ধ পরিবেশকে তথা সিস্টেমকেই ভেঙে দিতে পারে। সে কোনো শাসন মানে না। হুকুম মেনে কাজ করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। এ হেন রঞ্জন যক্ষপুরীতে আসা মানে সর্দারদের পক্ষে যে সমূহ বিপদ তা বলাই বাহুল্য।

চরিত্রটির এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিলে তার রহস্যময়তাকে বোঝা বোধ করি কষ্টকর হবে না। রবীন্দ্রনাথ নাটকের শিল্পরূপের স্বার্থেই রঞ্জনের চারপাশে রহস্যময়তার আবরণ দিয়েছেন। বুনো ঘোড়ার পিঠে চরে লাফ দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝে তির মেরে হা হা করে হাসা কিংবা শিকল কেটে বার বার বেরিয়ে পড়া এসবই চরিত্রটির জীবনাবেগের প্রবলতাকে বোঝাতে এসেছে। শুধু তাই নয় রঞ্জন যে কৃষিজীবী সভ্যতার প্রতিনিধি তাও তো যক্ষপুরীর বিপরীতে একটি প্রতিস্পর্ধী সভ্যতা তার কোদালের তালে তালে গান করা বা ভাঙা সারেঙ্গি বাজানোর মধ্যে দিয়ে সেই সভ্যতারই প্রকাশ। এইভাবেই রঞ্জন চরিত্রটি বাস্তব থেকে আদর্শে এবং আদর্শ থেকে বাস্তবে নাটকের শিল্পরূপের প্রয়োজন মিটিয়েছে।

অধ্যাপক

অধ্যাপক ‘রক্তকরবী' নাটকের একটি অপ্রধান চরিত্র। যক্ষপুরীর শাসনব্যবস্থায় সে এসেছে একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে, ঠিক যেমন শ্রেণিচরিত্র আমরা দেখেছি পুরাণবাগীশ, গোঁসাই প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে। যক্ষপুরীর রাজার শাসনব্যবস্থায় এরা সকলেই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের দল। এরা রাজার বেতনভোগী কর্মচারী। রাজার পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে এরা প্রাণপাত করেছে। যক্ষপুরীর ঐশ্বর্যময় রূপ ও উন্নতিতে এরা শুধু মুগ্ধ নয়, তার স্তাবকতাও করেছে।

অথচ এ হেন বুদ্ধিজীবী মানুষগুলি যক্ষপুরীর আবদ্ধ পরিবেশে থাকতে থাকতে ক্রমশ জীবন বিচ্ছিন হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদী সভ্যতার সাজানো বুলি মানুষদের শেখাতে এরা নিজেকেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। ফলে তৈরি হয়েছে সেই প্রাণের সংকট।

অধ্যাপককে নাটকের শুরুতেই আমরা দেখি যক্ষপুরীর স্তাবকতা করতে। যদিও তার কথাবার্তায় যক্ষপুরীর আবদ্ধ পরিবেশে থাকার যন্ত্রণা ও অতৃপ্তি বোধও আমরা লক্ষ করি। রাজার মতো তারও চারপাশে তৈরি হয়েছে পান্ডিত্যের জাল যা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। কিন্তু নন্দিনীর মতো মুক্তপ্রাণ নারীর সাহচর্য তার ভিতরকার মানুষটাকে জাগিয়ে তোলে। তাই নন্দিনীর রক্তকরবীর রক্ত আভায় সে ভয় লাগানো রহস্য খুঁজে পায়। নন্দিনীর কাছে সে চেয়ে নেয় একটি রক্তকরবী ফুল।

দ্বিতীয় কথোপকথনে অধ্যাপককে দেখি কিছুটা আত্মসংকটে ভূগতে। তার জ্ঞানভাণারের নিশ্চিন্ততায় বড়সড় ফাটল ধরেছে। ফলে সে হয়ে উঠেছে অসহায়। টিকে থাকার প্রক্রিয়ায় জাল শুধু বেড়েই চলেছে এটা সে উপলব্ধি করেছে। নাটকের শেষ পর্বে এই অধ্যাপককেই দেখি তার বস্তুতত্বের জাল ছিড়ে বাইরে আসতে। রাজা তার জালের মুখোস ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে - একথা শুনে অধ্যাপকও ছুটে বেরিয়েছে পুথিপত্র ফেলে তার সঙ্গ নিতে। রাজার জাল ছেঁড়ার ঘটনায় অধ্যাপকও উল্লসিত, যেন তারও পাণ্ডিত্যের জাল ছিড়েছে। ফলে তার মধ্যবিত্তের বাধা গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে অধ্যাপক যোগ দিয়েছে বৃহত্তর জনজাগরণে। নন্দিনীর পিছনে সেও ছুটে গেছে বৃহত্তর লড়াইয়ে - “আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব”।

সুতরাং একথা বলা যায় যে অধ্যাপক চরিত্রটি ‘রক্তকরবী’ নাটকে শ্রেণিচরিত্র হিসেবে এলেও চরিত্রটির যে বিবর্তন বা পরিবর্তন ঘটেছে তাতে মানবচরিত্র হিসেবেও সার্থক হয়ে উঠেছে।

ফাগুলাল

ফাগুলালের পরিচয় সে যক্ষপুরীর খোদাইকর। শ্রমিকশ্রেণির এই মানুষটি যক্ষপুরীর আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া একজন। কিন্তু মানুষটির মধ্যে গ্রামীণ সরলতা এখনও বর্তমান। সে নন্দিনীকে ভালোবাসে, তাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। বিশু তার বন্ধু। বিশুর সাহচর্য তাকে আনন্দ দেয়। সরল বলেই সে যক্ষপুরীর কর্মকাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। মদের নেশায় ভুলে থাকতে চায় তার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা।

এই সরল মানুষটিই নাটকের শেষে পরিণত হয়ে ওঠে। নন্দিনীর সাহচর্য তাকে বিদ্রোহী করে তোলে। তার সুপ্ত প্রতিবাদী সত্তা জেগে ওঠে তখনই, যখন বিশু বন্দি হয়েছে। এর জন্য সে নন্দিনীকে দায়ী করেনি বরং দলবল জুটিয়ে এনে বন্দিশালা ভাঙতে গেছে। বৃহত্তর সংগ্রামে সামিল হয়েছে। বলা চলে শোষিত শ্রমিক থেকে বৃহত্তর শ্রেণিসংগ্রামে উত্তরণই চরিত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সর্দার ও মোড়ল

যক্ষপুরীর শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে রাজা থাকলেও সর্দাররাই তার মূল স্তম্ভ। অনেকটা আমলাতন্ত্রের মতোই সর্দাররা যক্ষপুরীর শাসনকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রশাসনের শীর্ষে আছে বড়ো সর্দার, তারপর পদ অনুসারে মেজো ও ছোটো সর্দাররা এবং শেষে আছে মোড়লরা। তবে সর্দারই যক্ষপুরীর প্রধান নিয়ন্ত্রন। ঠাণ্ডা মাথার এই মানুষটির হিমশীতল কণ্ঠকে ভয় করে না এমন মানুষ নেই। সে কঠোরভাবেই যান্ত্রিক। তার হৃদয়ে মানবিকতার লেশ মাত্র নেই। তার ঠাণ্ডা মাথায় নিষ্ঠুরতার প্রমাণ পালোয়ানের শাস্তি কিংবা রঞ্জন হত্যার পরিকল্পনা। বলা চলে পশ্চিমী পুঁজিবাদী সভ্যতার যন্ত্রসর্বস্ব নিষ্ঠুরতার রূপটি সর্দারের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে।

অথচ নাটকে এই শ্রেণি বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে রক্তমাংসের মানব চরিত্র হয়ে ওঠার প্রমাণও চরিত্রটির মধ্যে আছে। কেননা নন্দিনীর প্রতি তীব্র আকর্ষণে সর্দারের নিষ্ঠুর হৃদয়ও দোলায়িত হয়েছে। যতই নন্দিনীর প্রাণোচ্ছলতা তাকে আকর্ষণ করেছে ভিতরে ভিতরে ততই সে বেসুরো হয়ে উঠেছে। তাই কর্তব্য পালনে সে এতখানি বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। নাটকের শেষদিকে জনপ্রতিরোধ ভাঙতে সে সৈন্য নিয়ে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার বর্শার আগে ঝুলিয়ে নিয়েছে নন্দিনীর দেওয়া কুন্দ ফুলের মালা।

মেজো সর্দার সামান্য সময়ের জন্য এলেও আমাদের আকর্ষণ করে। শম্ভু মিত্র চরিত্রটিকে ট্র্যাজিক বলতে চেয়েছেন। কেননা সর্দারের ভাষায় - "তোমারও দেখেছি রক্তের সঙ্গে সর্দারের রক্তের মিল হয়নি।"পুঁজিবাদী শাসকের মধ্যেও যে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য আছে এখানে তা স্পষ্ট। মেজো সর্দারের হৃদয়ের মানবিকতার বোধটি এখনও মরেনি। তাই অমানবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে যন্ত্রণা পাওয়াটাই তার ট্রাজেডি।

ঠিক বিপরীতধর্মী চরিত্র মোড়ল - ৩২১। চরিত্রটি একান্তভাবেই পুঁজিবাদের নগ্ন-চরিত্রের রূপ। তার দালালি, চাটুকারিতা, বিশুর প্রতি ঈর্ষা-বিদ্বেষ, স্বজন-পোষণ, তদ্বির তদারকি এবং স্বার্থপরতা আমাদের বিস্মিত করে । মেরুদণ্ডহীন এই মানুষগুলিকে সর্দাররা তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

চন্দ্রা ও গোকুল

একটু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা দরকার চন্দ্রা ও গোকুল চরিত্রদুটিকে। তারা নন্দিনীর প্রতি আকর্ষিত নয়, বিকর্ষিত হয়েছে। চন্দ্রা ফাগুলালের স্ত্রী। একান্তই গ্রাম্য এই নারী গ্রামে ফিরে ঘেতে চায়। বিশুকে সে 'বেয়াই' বলে, বিশুদাদার প্রতি তার স্নেহ প্রবল অথচ নন্দিনীকে সে বিপজ্জনক মনে করে। বিশুর বন্দিত্বের জন্য নন্দিনীকে দায়ী করে। তাকে 'রাক্ষসী', সর্দারদের 'চর', 'মায়াবিনী' প্রভৃতি বলতেও তার বাধে না। তার মতো সাধারণ চরিত্রের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

তবে নন্দিনীর প্রতি তার যে বিকর্ষণ, তার সঙ্গে গোকুলের দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। গোকুল বিশুকে ভালবাসে কিন্তু নন্দিনীকে সে মনে করে ভয়ংকরী। বিশু বন্দি হলে সে নন্দিনীকেই সরাসরি দায়ী মনে করে ও তাকে পুড়িয়ে মারার প্রস্তাব দেয়। শারীরিকভাবে আঘাত করতে উদ্যত হয় তার হাতুড়ি নিয়ে। তার ক্রোধ, নন্দিনীর প্রতি এই আচরণ অসংগত নয়। নন্দিনী তাকে আকর্ষণ করেনি, বরং তাকে দেখে বিকর্ষণই জন্মেছে। গোকুল এবং চন্দ্রা এই দুটি নাট্যচরিত্র রক্তকরবীর নাট্যগুণকেই বৃদ্ধি করেছে। নাট্যকাহিনির জন্যই তাদের এমন উপস্থিতি।

১০.৭। অনুশীলনী

১। 'রক্তকরবী' নাটকের কেন্দ্রীয় সংঘাতটির পরিচয় দিন।

২। বিশু ও রঞ্জন চরিত্রটির নাট্য-উপযোগিতা বিচার করুন।

৩। 'রক্তকরবী' নাটকটিতে পৌরাণিক আবহ থাকলেও এর সমাজ বাস্তবতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে – আলোচনা করুন।

৪। নন্দিনী চরিত্রটিকে সার্থক মানব চরিত্র হিসেবে দেখা কতদূর সংগত তা আলোচন করুন।

৫। রাজা চরিত্রটির স্বরূপ আলোচনা করে রবীন্দ্রনাটকের ধারায় চরিত্রটির বিশিষ্টতা তুলে ধরুন।

৬। 'রক্তকরবী'র অপ্রধান চরিত্রগুলির নাট্য-উপযোগিতা বিচার করুন।

৭। 'রক্তকরবী' নাটকটির সমাজবাস্তবতা ও পুঁজিবাদী শোষণ চিত্রের পরিচয় দিন।

৮। 'রক্তকরবী' নাটকের প্রধান বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১০.৮। গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস - অজিতকুমার ঘোষ।

২। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী।

৩। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা - উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৪। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা - নীহাররঞ্জন রায়।

মন্তব্য

৫। রক্তকরবী: পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ - সম্পাদনা - প্রণয়কুমার কুন্ডু।

৬। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক - শঙ্খ ঘোষ।

৭। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ - শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়।

৮। নাটক 'রক্তকরবী' - শম্ভু মিত্র।

৯। রক্তকরবী অন্য ভাবনায় – সৌমিত্র বসু।

একক: ১১। রক্তকরবী: আঙ্গিক বিচার

বিন্যাসক্রম

১১.১। রক্তকরবীর শ্রেণি বিচার

১১.২। রক্তকরবীর গঠনরীতি

১১.৩। রক্তকরবীর সংলাপ বিচার

১১.৪। রক্তকরবীতে প্রতীক ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ

১১.৫। রক্তকরবী নাটকে সংগীতের ব্যবহার প্রসঙ্গ

১১.৬। অনুশীলনী

১১.৭। গ্রন্থপঞ্জি

১১.১। রক্তকরবীর শ্রেণি বিচার

সাধারণভাবে 'রক্তকরবী' নাটককে শ্রেণিবিচারে রূপক-সাংকেতিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য 'শারদোৎসব' থেকে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত নাটক লিখেছেন সেগুলি প্রচলিত প্রথাগত নাটক থেকে এতটাই স্বতন্ত্র যে সমালোচকরা নাটকণগুলি সম্পর্কে যুতসই বিশেষণ পাননি। যেহেতু বাইরের নাট্যসংঘাত অপেক্ষা চরিত্রের অন্তর্সংঘাতই এগুলিতে মুখ্য এবং যেহেতু নাটকগুলি গভীর ভাবমূলক তাই এগুলিকে আইডিয়া বা তত্ত্বনাটক বা রূপক সাংকেতিক নাটক আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই ধরনের বিশেষণে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট ছিলেন না। 'রক্তকরবী'-র 'নাট্যপরিচয়'-এ তিনি বলেছেন- "এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না।"আবার অভিভাষণে জানিয়েছেন- "আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গুঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়।" বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ নাটকটির একটি

গূঢ় অর্থ স্বীকার করেছেন। তিনি নাটকটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মধ্যেও একটি গূঢ় রূপক অর্থ এসেছে। যাইহোক, রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসেবে এ নাটককে বিচার করা অসংগত হবে না।

'রক্তকরবী'-তে রূপকের প্রয়োগ আছে। যক্ষপুরীর ধারণাটাই রূপক। যক্ষপুরী প্রকৃতপক্ষে কোনো পৌরাণিক নগর নয়, যক্ষপুরীতে আবিষ্কৃত সোনার খনিও কোনো প্রকৃত খনি নয়। আসলে এই রূপকের আড়ালে ব্যঞ্জিত হচ্ছে এক আধুনিক শিল্পনগরী । যক্ষপুরীর রাজা আসলে সুপ্রিম পাওয়ার, সংস্থার কর্ণধার বলা যেতে পারে। সর্দার-মোড়লরা অনেকটা ম্যানেজার-সুপারভাইজারদের মতো। সব মিলিয়ে যক্ষপুরীর রূপকে নাটকটিতে তুলে ধরা হয়েছে আধুনিক এক শিল্পনগরীর চালচিত্র।

এই রূপকের পাশাপাশি নাটকটিতে সাংকেতিকতা বা প্রতীকের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। যেমন- রাজার যে জালের জানালা, তা আসলে নিজেরই তৈরি করা জন-বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। 'রক্তকরবী' ফুলটি তেমনি দুর্জয় প্রাণশক্তির প্রতীক, যৌবনের প্রতীক। রাজার মুখে যে 'প্রকাণ্ড মূরুভূমি', 'ক্লান্ত পাহাড়' কিংবা হাজার বছর টিকে থাকা ব্যাঙ্গটির কথা এসেছে, তাও সুবিশাল নির্ভরতা ও ক্লান্তি এবং প্রাণহীন অস্তিত্বের প্রতীক। রঞ্জনকে রক্তমাংসের মানুষ অপেক্ষা যৌবনের প্রতীক ব্লেই বেশি মনে করা হয়। নীলকণ্ঠ পাখির পালকের উল্লেখে প্রতীকায়িত হয় এক ধরনের শুভবোধ ও শুভ জয়যাত্রা। রাজার এঁটোদের মধ্যে দিয়ে প্রতীকায়িত হয়েছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর শোষণের ইতিবৃত্ত। এমনকি খোদাইকরদের পিঠে লেখা নম্বরগুলি সংকেত করছে ব্যক্তিপরিচয়-হীন শোষিত মানুষদের খণ্ডব্যক্তিত্বকে। সবমিলিয়ে 'রক্তকরবী' নাটকে সংকেতের বহুল ব্যবহার আছে, যার ভিত্তিতে এটিকে সমালোচকরা 'সাংকেতিক নাটক' বলেছেন।

'রক্তকরবী'-র মধ্যে রূপক আছে সাংকেতিকতাও আছে একথা মেনে নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু তা আছে বলেই এটিকে রূপক সাংকেতিকতার গোত্রে ফেলাটা ঠিক নয়। 'রক্তকরবী'-র পাপড়ির আড়ালের অর্থটি বুঝে নিলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি এই নাটক কতখানি বাস্তব। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলির চাকচিক্যের পিছনে শোষণ অত্যাচারের ও অমানবিকতার যে নিষ্ঠুর ছবি রবীন্দ্রনাথ

এঁকেছেন, তা একুশ শতকের উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাই কেবলই তাত্ত্বিকতা বা রূপক সাংকেতিকতার মোহর দিলে এই চিরন্তন বাস্তবতাকে কিছুটা দূরে ঠেলে দেওয়া হয়।

শ্রেণিবিচারে আর একটি দিকও দেখে নেওয়া জরুরি। 'রক্তকরবী' কি ট্রাজেডি? প্রথাগতভাবে উঠে আসা এই প্রশ্ন 'রক্তকরবী'-র ক্ষেত্রে আদৌ প্রসঙ্গিক কিনা - সেটা বিতর্কের ব্যাপার। সে বিতর্কে দূরে সরিয়ে এটুকু বলা যেতেই পারে যে 'রক্তকরবী'-র মধ্যে ট্রাজেডির উপাদান আছে। রাজার তৈরি বিশাল যক্ষপুরীর শাসনব্যবস্থা তারই দুর্বলতায় ও তৃতীয় শক্তির চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় - ঘটনাটি আপাতভাবে ট্র্যাজিক। ঠিক যেমন ট্রাজিক সংগ্রাম ও প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা নেতা বিশুর বন্দি হওয়া, রঞ্জন ও কিশোর অপরাধহীন হওয়া সত্বেও তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার ঘটনা এবং প্রিয়জন হারানো নন্দিনীর মৃত্যুর দিকে ছুটে যাওয়া।

কিন্তু এই ট্রাজিক ঘটনাগুলি সমস্তই মূল্যহীন হয়ে পড়ে নাটকের শেষে এক সর্বব্যাপী মুক্তির ব্যঞ্জনায়। রাজার জাল ছেঁড়া কিংবা শেষ লড়াইয়ে সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে চলার মধ্যে রয়েছে এক মুক্তির ব্যঞ্জনা। রঞ্জনের

মৃত্যুও সেখানে অপরাজেয় বীরত্বের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। নাটকের শেষে পৌষের গানে পাকা ফসলে ধূলার আচল ভরে ওঠার মধ্যে দিয়ে সেই মুক্তির ব্যঞ্জনাই ফুটে উঠেছে। কাজেই ট্রাজেডির উপাদান থাকা সত্তেও নাটকটি কোনোমতেই ট্রাজেডি নয়, নাট্যকারের সেই অভিপ্রায়ও ছিল-না।

বরং ট্রাজিক অবস্থা থেকে যে মিলনান্তক বোধে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে, তাতে নাটকটিকে ট্রাজিকমেডি বলা চলে। অবশ্য একে ট্রাজিকমেডি বললে অধিকাংশ রবীন্দ্রনাটককে তাই-ই বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কোনো ট্রাজেডি অথবা কমেডি অথবা ট্রাজিকমেডি লেখার অভিপ্রায় নিয়ে এ নাটক লেখেননি। তিনি লিখেছেন একখানি আধুনিক নাটক, আধুনিক যুগের বাস্তব সমস্যাই যেখানে মূল প্রতিবাদ্য। আর বাস্তবকে শিল্পরূপ দিতেই তাকে অবলম্বন করতে হয়েছে কিছু শিল্পকৌশল। তাকে রূপক বলি, সাংকেতিক বলি, পৌরাণিক বলি কিংবা ট্রাজেডি আসলে সবই শিল্পের প্রয়োগরীতি। কীভাবে, কোন্

পদ্ধতিতে তা নেবেন - সে অধিকার নাট্যকারের একার, সমালোচকের নয়। আসলে এগুলি জীবনের নাটক; যাকে কোনো সংরূপে নির্দিষ্ট করা যায় না।

১১.২। রক্তকরবীর গঠনরীতি

'রক্তকরবী' যে কোনো প্রথাগত নাটকের আঙ্গিকে লেখা নয়, তা আমরা আগেই জেনেছি। 'শারদোৎসব' থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকের কিছু স্বকীয় লক্ষণ দেখা যায়। যেমন অঙ্ক দৃশ্য ভাগ যা প্রথাগত নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি। এমনকি 'রক্তকরবী'-র নাট্যনির্দেশ নেই। আবার স্থান-কালের ঐক্য যা গ্রিক নাট্যকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা এখানে থাকলেও ঠিক প্রথাগতভাবে আসেনি। নাটকটির নাট্যসংঘাত বা নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টির যে কৌশলগুলি রবীন্দ্রনাথ অবলম্বন করেছেন তা তারই স্বকীয়রীতি।

'রক্তকরবী'-র আঙ্গিকের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল অঙ্ক দৃশ্যহীন নাটসংলাপ। গ্রিক নাট্যকের সময়েও অন্ধ দৃশ্যভাগ ছিল। শেক্সপিয়রের নাটক পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত হত, প্রত্যেকটি অঙ্ক আবার কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত হত। এই পাঁচটি অঙ্ক দৃশ্যে নাটকের কাহিনিটি নাট্যদ্বন্দ্ব অনুসারে সূচনা-বিন্দু থেকে ঘটনার আরোহণ - শীর্ষবিন্দু ঘটনার অবরোহণ হয়ে উপসংহারে পৌছয়। একে বলে পঞ্চাঙ্ক সন্ধি যা সেক্সপিয়রের নাটকের গঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'রক্তকরবী'-তে অঙ্ক দৃশ্য বিভাগ নেই। নেই কোনো পর্ব-ভাগও। কিন্তু অঙ্ক দৃশ্যভাগ না থাকলেও নাট্যঘটনার ক্রম-অগ্রগতিকে যদি ঠিক মতো অনুধাবন করা যায়, তাহলে আমরা এর মধ্যে অদৃশ্য এক পঞ্চাঙ্ক সন্ধি দেখতে পাব। নাটকের শুরু থেকে চন্দ্রা ফাগুলালের প্রথম প্রবেশ ও প্রস্থান পর্যন্ত অংশকে বলা যেতে পারে নাটকের সূচনা বা ভূমিকা অংশ। এই অংশে নাট্যকাহিনির মূল সমস্যাটি ফুটে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি চরিত্রেরই প্রবেশ ঘটেছে এবং নাটকে যে নন্দিনীকে নিয়ে একটি দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে। বিশুপাগলকে নিয়ে নন্দিনীর কথোপকথন থেকে নাট্যদ্বন্দ্ব ক্রমশ বেড়েছে। এই অংশ থেকেই নাট্যদ্বন্দ্বর আরোহণ ঘটেছে। বিশুকে নন্দিনীর সঙ্গে দেখে রাজা ক্রুদ্ধ হয়েছে। ক্রুদ্ধ রাজা নন্দিনীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, আবার তার চুলের মধ্যে হাত রেখে মরণের মাধূর্য অনুভব করে। অন্যদিকে রঞ্জনকে নিয়ে সর্দার মোড়লদের মধ্যে ষড়যন্ত্র

চলে। বোঝা যায় চূড়ান্ত এক সংঘাতের দিকে নাটক এগোচ্ছে। ক্রমে রাজার খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা রাজার এঁটোদের নন্দিনী দেখতে পায়। দেখতে পায় গজ্জু পালোয়ানের শাস্তি, এর পরেই বিশুর বন্দি হওয়া এবং সর্দারের মুখোমুখি হয়ে নন্দিনীর সর্দারকে চ্যালেঞ্জ করা - "দেখব, তোমার সাধ্য কিসের।" নাট্যকাহিনি চূড়ান্ত এক সংঘাতের মুখোমুখি হয় এখানেই এবং সেই সংঘাত দ্রুত ঘনীভূত হয় নন্দিনী যখন পাগলের মতো রঞ্জনকে খুঁজে চলে ধ্বজাপূজার আয়োজন বহনকারীদের কাছে। তার পরেই রাজার দরজায় ঘা দিয়ে বলে - "সময় হয়েছে, দরজা খোলো।" রাজা তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কথা তুলে বলে- "আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কোর না। আজ ভয় করতেই হবে।"এর উত্তরে নন্দিনীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্য - "তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।" এই বাক্যই রাজার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রাজা ভেঙে ফেলেন তার জালের দরজা। এই ঘটনাই নাটকের ক্লাইম্যাক্স বা শীর্ষবিন্দু। এরপরে দ্রত নাট্যঘটনার অবরোহণ ঘটে। রঞ্জন ও কিশোরের মৃত্যু রাজার চেতনাকে জাগিয়ে দেয়। রাজা বুঝতে পারে সে নিজের যন্ত্রের হাতেই বন্দি। সুতরাং তার নিজের যন্ত্রকে ভাঙার জন্য যে বদ্ধ পরিকর হয়। খোদাইকররা এগিয়ে আসে রাজাকে বাধা দিতে। চূড়ান্ত সংঘাতের মুখোমুখি হয়ে নন্দিনী এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। নন্দিনীর পিছনে শেষ মুক্তিতে ছুটে যায় রাজা-বিশু-অধ্যাপকরাও। এভাবেই নাটকের দ্রুত উপসংহার ঘটে।

পঞ্চাঙ্ক সন্ধির এই অনুভব নাটকটিতে পাওয়া গেলেও গ্রিক নাটকের ত্রি-ঐক্য সেভাবে অনুভূত হয় না। স্থানগতভাবে নাটকটি একটিমাত্র স্থানে ঘটেছে রাজার প্রসাদের জালের জানালার বহির্ভাগে। দৃশ্য বলতেও ওই একটি। কাজেই নাটকে যে সমস্ত ঘটনাক্রম ঘটে, ফাগুলালদের মদ খাওয়া নিয়ে ঝগড়া কিংবা নন্দিনীকে নিয়ে বিশুর গান গাওয়া, সর্দারদের ষড়যন্ত্র কিংবা বিশুকে বন্দি করে বন্দিশালার পথে নিয়ে যাওয়া সমস্ত ঘটনাই একই স্থানে ঘটছে। স্থানগত-সীমা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, অথচ দৃশ্য পরিবর্তিত হচ্ছে না। কাজেই প্রথাগতভাবে স্থান-ঐক্য এ নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ঠিক যেমন প্রযোজ্য নয় কালগত বা সময়গত-ঐক্য ব্যাপারটি। 'রক্তকরবী'-র ঘটনা সকাল থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত একটি দিনের ঘটনা হলেও অনেক সময়ই তা এই কালসীমাকে

অতিক্রম করে গেছে। সেই দিন অস্ত্রপূজার দিন ছুটির দিন, আবার সেই দিনেই কাজ কামাই হয় কিশোরের। সেই দিনটিতেই আবার রঞ্জন বন্দি হয় যদিও যক্ষপুরীতে তার আগমন যেন বহু প্রতীক্ষিত - সে এসেছিল, সে আসার জন্য নন্দিনী প্রতীক্ষা করবে, ঠিক যেমন সময়কে ভেঙে চুরে রাজাতিন হাজার বছর টিকে থাকার মন্ত্র শিখে নেয় একটি ব্যাঙের কাছ থেকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে স্থান-কালের প্রথাগত গণ্ডিতে এই নাটক বাঁধা নয়, পঞ্চাঙ্ক সন্ধির প্রথাগত ভাগও তাই এ নাটকে প্রাসঙ্গিক নয়। আপাতভাবে একটি দিনের সময়সীমায়, একটি মাত্র স্থানিক পটভূমিতে এই নাটক এক বিশাল ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে গেছে। আধুনিক এই নাট্যকাহিনিকে ধরার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন ছিল প্রথাগত অঙ্ক দৃশ্যহীন, স্থান-কালের প্রথামাফিক সীমানাকে ভেঙে চুরে নতুন এক নাট্যরীতিকে গ্রহণ করা। ‘রক্তকরবী’ সেই অভিনব নাট্যরীতিতেই লেখা।

১১.৩। রক্তকরবীর সংলাপ বিচার

সংলাপ নাটকের প্রধানতম অবলম্বন। চরিত্রের সংলাপ-পরম্পরায় একটি নাটক গড়ে ওঠে । নাটকের সংলাপ অনেকটা মুখের ভাষার কাছাকাছি হলেও, লিখিত সংলাপে সচেতন নির্মিতি চলে আসে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ সম্পর্কে এই একই কথা প্রযোজ্য । সেই সংলাপের ভাষা বাস্তবানুগ হয়েও বাস্তবের মুখের ভাষার থেকে স্বতন্ত্র। বিশেষ করে তার সব নাট্যচরিত্রের সংলাপের ভাষাই এক ধরনের। একে বলা যেতে পারে একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিক। শারদোৎসব থেকে যে নতুন ধরনের নাট্যরীতির সূত্রপাত তিনি ঘটিয়েছেন; তাতে সংলাপের ভাষাও কিছুটা স্বতন্ত্র। তার মধ্যে অলংকৃত-ভাবটি যেমন আছে, তেমনি সে সংলাপের মধ্যেই নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টির যথেষ্ট উপকরণ থাকছে। উপমা-প্রতীকের ব্যবহারে এবং কখনো কাব্যিক ব্যঞ্জনায় সংলাপকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্নতর তাৎপর্য দিয়েছেন। ‘রক্তকরবী’-নাটকের সংলাপ সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

'রক্তকরবী' নাটকের নাট্যসংলাপ বিচার করতে গেলে মনে রাখতে হবে চরিত্রগুলির কথা। নাটকটিতে আমরা কয়েক ধরনের চরিত্র দেখতে পাই। যেমন রাজা-সর্দার-অধ্যাপক-পুরাণবাগীশ এরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তসুলভ নাগরিক শ্রেণির মানুষ অন্যদিকে চন্দ্রা-

ফাগুলাল-গোকুল-কিশোর হল খোদাইকর। তাদের সংলাপের ভাষা কিছুটা অমার্জিত। আবার নন্দিনী ও বিশুকে এই দুই শ্রেণি থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র মনে হয়। তাদের সংলাপের ভাবায় এই পার্থক্য সূক্ষ্মভাবে হলেও ধরা পড়েছে।

রাজা যখন বলে- "আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা"- এই সংলাপের ভাষায় ধরা পড়ে একাকিত্বের গভীর ব্যঞ্জনা যা শিক্ষিত নাগরিকের মুখেই শোনা যায়। আবার অধ্যাপকের ভাষা অনেকটা পরিশীলিত বুদ্ধিজীবীর মতোই। তার সংলাপে শোনা যায় অনেক গভীর ব্যঞ্জনাবাহী উপমা প্রতীকের ব্যবহার। 'যক্ষপুরী গ্রহণ-লাগা পুরী। সোনার গর্ভের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে।' কিংবা 'সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা'- এই সমস্ত সংলাপের মধ্যে বুদ্ধিজীবীর পরিশীলিত ভাষা-বোধ এবং স্বকীয় বাক্ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

ঠিক একই শ্রেণির হলেও বিশু বা নন্দিনীর সংলাপের ভাষা কিছুটা স্বতন্ত্র। বিশু সম্পর্কে মনে রাখা দরকার, সে খোদইকর হলেও শিক্ষিত। প্রচুর পুথি পড়া মানুষ । ভাগ্যের ফেরে যক্ষপুরীতে এসে প্রথমে চর পরে ব্যর্থ হয়ে খোদাইকর হয়েছে। কিন্তু মানুষটির শিক্ষিত সত্তার অপমৃত্যু ঘটেনি। শুধু তাই নয়, অশিক্ষিত খোদইকরদের মধ্যে বিশু শিক্ষিত হওয়ায়, তার সংলাপের ভাষা যথেষ্ট আলাদা। অনেকক্ষেত্রেই উপমা দিয়ে সে কথা বলেছে। যেমন - "তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই - সোনাব্যাঙ যতই মকমক শব্দে কোলাব্যাঙের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পৌছয় বোড়া সাপের।"এই সংলাপে উপমাটি দীর্ঘ। অনেকটা প্রবচনের মতো তার সংলাপের উপমা । তার ভাষাকে তাই চন্দ্রা-ফাগুলালেরা সহজে বুঝতে পারে না। তাছাড়া বিশু তাদের কাছে অনেকটা নেতৃত্ব স্থানীয়। তাই বুঝিয়ে বলবার, শিক্ষা দেবার একটা প্রবণতাও তার সংলাপে আছে।

এই সংলাপই বদলে যায় যখন বিশু নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলে। তার ভালোবাসার মানুষটিকে কাছে পেয়ে বিশু অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। তার পুরোনো স্মৃতি যেন বেদনার রূপ পায় - "হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে পড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে।" এখানে তার সংলাপের ভাষা অনেকটা কবিতার লাবণ্য মাখা হয়ে উঠেছে। বিশুর মতোই নন্দিনীর সংলাপ কিছুটা কাব্যিক। কিন্তু এই

মুক্তপ্রাণ নারীর সংলাপের ভাষায় রয়েছে সরল গতি এবং আন্তরিকতা । সময় ও পরিস্থিতিতে কখনো তা হয়ে উঠেছে কবিতার মতো মায়াময়, কখনো বা তীব্র তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠাময় অথবা ভৎর্সনাময়। তার মুখেই শোনা যায়- "সর্দার, যেয়ো না, বলে যাও আমার বিশুপাগলকে কোথায় নিয়ে গেছ"। আর কিছু পরেই তারই মুখে উচ্চারিত হয় এই তীক্ষ্ণ সংলাপ- "বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া" ।

নাটকে খোদাইকরদের চরিত্রের সংলাপের ভাষাভঙ্গি অনেকটাই স্বতন্ত্র। সরল কিশোরের ভাষায় সদ্য যৌবনসুলভ ঔদ্বত্য এবং প্রগলভতা রয়েছে। 'নন্দিনী নন্দিনী' বলে তার ডাকের মধ্যেই রয়েছে সেই সরলতা।

আবার নন্দিনী তাকে সামলে চলার কথা বললে কিশোর তার উত্তরে বলে- "না, আমি সামলে চলব না, চলব না।ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।"এখানে কিশোরের সংলাপে রয়েছে যৌবনের ঔদ্ধত্য। কিশোরের থেকে কিছুটা ভিন্ন ফাগুলাল ও চন্দ্রার ভাষা । এরা গ্রামের থেকে আসা মানুষ। অশিক্ষিত সরল এই মানুষগুলির সংলাপের ভাষা সহজ সরল। চন্দ্রার ঘর যাওয়ার বায়না ধরা কিংবা ফাগুলালের "প্রণামি আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।"তার সরলতাকেই প্রকাশ করে। এমনকী তাদের সংলাপের উপমাগুলিও গ্রাম্যজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া- "আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তুঁষ? ফালতো কিছুই নেই?" গোকুলের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য তার সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে। কাটা-কাটা সরল বাক্যে তীক্ষ্ণ সংলাপগুলি চরিত্রটির সন্দেহ পরায়ণতা ও চাঞ্চল্যময়তাকে প্রকাশ করেছে। "আমি কিচ্ছু তোমাকে বিশ্বাস করি নে। একটা কী ফন্দি করেছ। আজ দিন না যেতেই একটা কিছু বিপদ ঘটাবে। তাই এত সাজ। ভয়ংকরী, ওরে ভয়ংকরী!" হাতুড়ি নিয়ে উদ্যত তার সংলাপে শারীরিক আগ্রাসনের ছবিটাও ফুটে ওঠে।

১১.৪। রক্তকরবীতে প্রতীক ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ

'রক্তকরবী' নাটকে সংকেতের বেশ কিছু প্রয়োগ আছে। ফলে প্রতীক এবং চিত্রকল্পের বহুল প্রয়োগ এ নাটকে দেখা যায়। বলার কথা এই যে, নাটকের মধ্যে এ ধরনের কাব্যিক শিল্পরীতির প্রয়োগ কতখানি যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে তর্ক আছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে 'রক্তকরবী' প্রথাগত নাটকের থেকে স্বতন্ত্র। এর শিল্পরীতি রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় শিল্পভাবনা থেকে এসেছে। সংলাপে যে ব্যঞ্জনা বা সংকেতকে তিনি প্রকাশ করেছেন, তাতে প্রতীক বা চিত্রকল্পের প্রয়োগ এ ধরনের নাটকে স্বাভাবিক। তবে এই আলোচনায় প্রবেশের আগে আমরা দেখে নেব চিত্রকল্প কী?

'রক্তকরবী' নাটকে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি অনেকক্ষেত্রেই বহুস্তরীয় তাৎপর্যে মন্ডিত এবং তা নাট্য-অভিঘাত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিয়েছে। যেমন অধ্যাপকের সংলাপে খোদাইকরদের "দরকারের বোঝা মাথায় কাচের মতো সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে উপরে উঠে" আসার চিত্র দেখেছি। এই চিত্রকল্পই ভিন্নতর তাৎপর্যে নাট্যঅভিঘাত সৃষ্টি করে যখন একই উপমা অধ্যাপক নিজের সম্পর্কে বলে "আমরা নিরেট নিরবকাশ গর্ভের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি।"একই-ভাবে নন্দিনী সম্পর্কে অধ্যাপক বলে পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে আসা আচমকা আলো। এই চকিত আলোয়ে যে চিত্র কল্পটি তৈরি হল তা পরবর্তী সময়ে ভিন্নতর তাৎপর্য পেয়ে যখন সর্দার তাকে বলে - ইন্দ্রদেবের আগুন। প্রতিবাদের তীক্ষ্ণতা নিয়ে চিত্রকল্পটি এখানে নাট্যসংঘাত তৈরি করেছে।

বাজার বর্ণনায় তেমনভাবেই এসেছে শিকারি বাজপাখির চিত্রকল্প। শিকারির হিংস্র ছবিটা এই চিত্রকল্পে ব্যঞ্জিত হয়েছে। ঠিক এই চিত্রকল্পটির নতুন এক নাট্যসংঘাতের মুখোমুখি হয় যখন তার বিপরীতে কৃষিজীবী সভতায় শুভ বোধের প্রতীক নীলকণ্ঠ পাখির কথা আসে। রাজাকে নিয়ে আরও কয়েকটি চিত্রকল্প তৈরি হয়েছে। যেমন মরুভূমির প্রকান্ডতা ও ঘাসকে লেহন করা, ক্লান্ত পাহাড়ের ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে যাওয়া, মধ্যাহ্ন সূর্য প্রভৃতি। এ সবই সুবিশাল একাকিত্বের ব্যঞ্জনাকে তুলে ধরে।

রাজাকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই চিত্রকল্পগুলির সঙ্গে নাট্যসংঘাত দেখা যায়, যখন রঞ্জন বা নন্দিনীকে নিয়ে তৈরি হয় ভিন্নধর্মী উপমা । যেমন রাজার একাকীত্বের শূন্য পাহাড়ের

সঙ্গেই সংঘাত তৈরি হয় রঞ্জনের জোরের উপমা শঙ্খিনী নদীর সঙ্গে। এমনকী রাজা যে নিজেকে আবদ্ধ সরোবরের সঙ্গে তুলনা করেছিল, তার সঙ্গে এই প্রবহমান শঙ্খিনী নদীর উপমাসংঘাত তৈরি হয়ে যায়।

নন্দিনীর সংলাপে আরও কিছু চিত্রকল্প বা ইমেজ তৈরি হয়েছে যা নাট্যসংলাপ হিসেবে 'রক্তকরবী'-র স্বাতন্ত্র্যকে চিনিয়ে দেয়। যেমন দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে রঞ্জনের তাকে তুফানের নদী পার করে দেওয়া। লাফ দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝে তির মেরে হা হা করে হাসা প্রভৃতি। একইভাবে রাজা সম্পর্কে নন্দিনীর কয়েকটি বর্ণনায় এসেছে উপমা – "কপাল খানা যেন সাত মহলা বাড়ির সিংহদ্বার", "বাহুদুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল।" কিংবা "বর্শাফলার মতো দৃষ্টি" নিয়ে রাজার তার দিকে তাকানো। এই চিত্রকল্পগুলি রাজা সম্পর্কে যে বিরাট ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণতার বোধ তৈরি করেছে, তাতে চরিত্রটির অসাধারণত্বকে চিনিয়ে দেয়।

'রক্তকরবী'-র এই চিত্রকল্পগুলি নাট্যসংলাপকে কতখানি সার্থক করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। একটি নাটকে এই ধরনের কাব্যিক ইমেজ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও তর্ক আছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, 'রক্তকরবী' প্রথাগত নাটক নয়। আর রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপের বৈশিষ্ট্যই হল ঘটনা-সংঘাত অপেক্ষা ভাব-সংঘাতকে বেশি করে তুলে ধরা । আর নাটকটিতে সেই ভাব-সংঘাত সৃষ্টিতে এই চিত্রকল্পগুলির ভূমিকা অনন্য। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিতভাবেই নাটকটিতে চিত্রকল্পের সুচারু ব্যবহার ঘটিয়েছেন। নাট্যসংঘাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই চিত্রকল্পগুলি সার্থক ও যথাযথ হয়েছে। সুতরাং 'রক্তকরবী'-তে চিত্রকল্পের ব্যবহার রবীন্দ্র নাট্যসংলাপ সৃষ্টির মুন্সিয়ানাকেই প্রকাশ করেছে।

১১.৫। রক্তকরবী নাটকে সংগীতের ব্যবহার প্রসঙ্গ

'রক্তকরবী' নাটকে মোট আটটি গান আছে। এই গানগুলি নাটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। নাটক মূলত সংলাপ নির্ভর রচনা। তার মধ্যে সংগীতের প্রয়োগ কতখানি যুক্তিযুক্ত এনিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গড়পড়তা বাংলা নাটকে সংগীতের যে-সব প্রয়োগ দেখা যায়, তার অধিকাংশই নাট্য-তাৎপর্যহীন শুধু দর্শক মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রচিত।

প্রকৃতপক্ষে সংগীতের ব্যবহার তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন সংগীত সংলাপের ভূমিকা নেয়।

নাটকের এমন মুহূর্ত আসতে পারে যখন সংলাপ কথায় তা ব্যক্ত করা চলে না। তা সংগীতের মধ্যে দিয়ে বলা যায়। অর্থাৎ সংগীত এখানে দুই সংলাপের মধ্যবর্তী বহু না-বলা কথা ও অনেক ব্যঞ্জনাকে নাট্যতাৎপর্যে মণ্ডিত করে। রবীন্দ্রনাটকে সংলাপের ব্যবহার বরাবরের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। 'শারদোৎসব'- 'রাজা' কিংবা 'ফাল্গুনী' প্রধানত সংগীতপ্রধান নাটক। 'মুক্তধারা'তেও সংগীতের প্রয়োগ যথেষ্টই। 'রক্তকরবী'-তে আটটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা এই গানগুলির তাৎপর্য ও তার সার্থকতা কতখানি হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করছি।

'রক্তকরবী'-র প্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গানটি হল "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে।" নাটকের প্রথম দিকে নন্দিনী-রাজার প্রথম সংলাপগুচ্ছে এই গানটি নেপথ্য থেকে ভেসে এসেছে। গানটি "ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক"। সে গানের মধ্যে দিয়ে যক্ষপুরীর আশাহীন অন্ধকারের বিপরীতে মুক্তির আহবান, প্রেমের আহবান ধ্বনিত হয়েছে। যেখানে "রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে।" এমনই এক মুক্ত পরিবেশে রাজাকে মাঠে নিয়ে যাওয়ার আহান জানায় নন্দিনী। রাজাকে দুয়ার খোলার আহান জানায়। লক্ষণীয়, গানটি পৌষের গান। যক্ষপুরীর পুঁজিবাদী সভ্যতার বিপরীতে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার মুক্ত জীবনের হাতছানি যেভাবে এই গানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তাতে, গানটিকে 'রক্তকরবী'-র থিম সঙ ভাবা যেতে পারে। কেননা এই গান আবারও পরে ফিরে আসবে ভিন্ন এক তাৎপর্য নিয়ে। তখন আমরা দেখব কীভাবে গানটি নাটকের মূল বিষয় বা সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য পেয়ে গেছে।

'রক্তকরবী'তে আটটি গানের ছটিই বিশুর গাওয়া। এতে মনে হতে পারে বিশু গায়ক চরিত্র। কিন্তু যে অর্থে কোনো চরিত্রকে 'গায়ক' চরিত্র বলতে হয়, বিশু তা নয়। তবে সে গান ভালোবাসে। যক্ষপুরীতে নন্দিনীকে সে গান শোনায়। শুধু নন্দিনী নয়, তার গানের শ্রোতা অন্যান্য খোদাইকররাও। আর যে গানগুলি বিশু গেয়েছে, সেগুলির মধ্যে দুটি দিক প্রকাশিত হয়েছে। একটি দিক হল তার গান গভীর অর্থপূর্ণ অনেকটা লোকশিক্ষার মতো। আর একটি দিক হল তার ব্যক্তিগত বেদনার প্রকাশ। যেমন প্রথমেই সে ফাগুলালের

মদ খাওয়া নিয়ে গেয়েছে- 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে/তবে মরণ রসে নে পেয়ালা ভরে।' ষক্ষপুরীর আনন্দহীন বন্দি জীবনে পরাভূত মানুষগুলির কাছে মরণ রস বা মদের নেশা যে জীবনের সব ব্যর্থতাকে রঙিন করে তোলার জন্য তা বিশুর গানের প্রধান ইঙ্গিত। চন্দ্রার প্রশ্নের উত্তর এই গানের সুরেই সে দিয়েছে। এরকমই বিশুর আর একটি গান- 'শেষ ফলনের ফসল এবার / কেটে লও বাঁধো আঁটি / বাকি যা নয় গো নেবার / মাটিতে হোক তা মাটি।' চার লাইনের এই ছোট্ট গানটির তাৎপর্য অসীম। বন্দি বিশু এখানে অনেকটাই বিপ্লবী নেতার ভূমিকা নিয়েছে। গানের শুরুতে সে বলেছে – "মাঠের লীলা শেষ হল, খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল।"তারপরেই এই গান চাষিদের উদ্দেশ্যে। সেই ফসল নিজেদের অধিকারে রাখতে হবে, যেন এমনই এক ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ইঙ্গিত তার গানে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

বিশুর ব্যক্তিগত দু:খ-বেদনার প্রকাশ ঘটেছে দুটি গানে – 'ও চাঁদ, চোখের জলে লাগল জোয়ার দুঃখের পারাবারে' এবং 'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে'। নন্দিনী তার পূর্ব জীবনের কথার সূত্রে বাজি খেলার ভিড় থেকে বিশুর একলা বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলে এবং জিজ্ঞেস করে - "কোথায় তুমি গেলে বলো তো।" একথার উত্তর ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা বিশুর ব্যক্তিগত বেদনার হৃদয় নিংড়ানো প্রকাশ তো সুরেই সম্ভব । 'ও চাঁদ' সেই বেদনারই বিমূর্ত প্রকাশ। 'যুগে যুগে বুঝি আমায়' - রঞ্জনের জন্য নন্দিনীর প্রতীক্ষা উপলক্ষে গাওয়া । অথচ বিশুর ব্যক্তিগত দুঃখ, চাঁদের আলোর সংগীতে তার অবসানও মিলনের আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। যেন দুঃখ ও মিলনের দুই বিপরীত পথ এখানে মিলে গেছে।

বিশুর অন্য দুটি গান তার স্বত:স্ফর্তভাবে গাওয়া। দুটি গানেই নন্দিনীর একটি সূত্র রয়েছে। নন্দিনীকে কাছে পেয়ে ইদানিং তার গানের গলা খুলে গেছে। 'মোর স্বপন তরীর কে তুই নেয়ে' এবং 'তোমায় গান শোনাব' আপাত দৃষ্টিতে নন্দিনীর প্রতি ইঙ্গিত করলেও, তা আনলে বিশুর জীবনের আদর্শ ভালোবাসার নারী। তাকে পাওয়ার, তাকে জানার ব্যর্থ আকুতি ও বেদনাই গানের মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করেছে।

নাটকে একটি মাত্র গান নন্দিনী নিজে গেয়েছে। যদিও সে গানটি বিশুর কাছে শিখেছে, তবু রাজাকে তার গানটি শোনানোর একটি ভিন্নতর তাৎপর্য রয়েছে। 'ভালোবাসি

ভালোবাসি' ভালোবাসার সুরের জাদুতে শুধু আকাশ বাতাস নয়, সাগরকূল নয়, রাজার ভিতরকার আবদ্ধ মানুষটিও যেন ভেসে যেতে পারবে। তাই এই ভালোবাসার বিরহের সুর রাজা সহ্য করতে পারেনি। সে মরা ব্যাঙ ফেলে রেখে পালিয়েছে।

নাটকের শেষে আবার ফিরে এসেছে সেই পৌষের গান যা আমরা নাটকের শুরুতে শুনেছি। বিশুর গাওয়া 'শেষ ফলনের ফসল এবার' গানটিও ছিল ফসলকাটার আবহ নিয়েই। পৌষের ডাক - মুক্ত প্রকৃতির হাতছানি এসব থেকেই, পৌষের ফসলের অধিকারের কথাও যেন চলে আসে। প্রথম গানে 'ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে' - এ ডালা ব্যক্তির, সমষ্ঠির নয়। আর এর থেকেই সম্পদের অসম বন্টন ঘটে, যার পরিণাম শোষণ ও মানবতার অপমৃত্যু। তারই বিরুদ্ধে বিশুর আহবান ছিল ফসল কেটে নেওয়ার বাকি যা থাকার তা তো প্রকৃতির মাঠেই থাকবে। নাটকের শেষে পৌষের গানই এসেছে যখন রাজা ভেঙে ফেলেছে তার বন্দিশালা। ভেঙে পড়েছে তার যন্ত্র। আর মানুষ মুক্তির আনন্দে শেষ লড়াইয়ে এগিয়ে গেছে। নাটকের শেষে এই গানের ফিরে আসা যেন সেই যুক্তির ইঙ্গিতই দেয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এখানে বদলে গেছে গানে একটি পংক্তি। 'ডালা যে তার ভরেছে' ইত্যাদির পরিবর্তে পাঠটি হয়েছে – 'ধূলার আচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে'। ডালার পরিবর্তে ধূলোর আচল - অর্থাৎ যা ছিল ব্যক্তিগত মালিকানায় আবদ্ধ - তা এবার ছড়িয়ে গেল সাধারণের মধ্যে। শোষণ মুক্তিতে সম্পদেরও সুসম বন্টনের ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন যা নাটকে একটি সুন্দর আগামীর পূর্বাভাস দিয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে 'রক্তকরবী' নাটকের গানগুলি নাট্যতাৎপর্য অসীম। গানগুলি অর্থের গভীরতায় ও পরিস্থিতির বিচারে নাটকটিকে সার্থক ও উচ্চাঙ্গের করে তুলেছে।

১১.৬। অনুশীলনী

১। গোকুল চরিত্রটির নাট্যতাৎপর্য লিখুন।

২। 'রক্তকরবী'-র পৌষের গানের তাৎপর্য ও নাট্য-উপযোগিতা বিচার করুন।

৩। 'রক্তকরবী' কি ট্রাজেডি? আপনার অভিমত লিখুন।

৪। 'রক্তকরবী' নাটকের পরিসমাপ্তির তাৎপর্য বিচার করুন।

৫। 'রক্তকরবী' নাটকটির নামকরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

মন্তব্য

৬। ‘রক্তকরবী’ নাটকটিকে রূপক সাংকেতিক নাটক বলা কতদূর সংগত তা বিচার করুন।

৭। ‘রক্তকরবী’ নাটকটির গঠনরীতির বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিন।

৮। ‘রক্তকরবী’-র সংলাপ রচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৯। ‘রক্তকরবী’তে মোট কটি গান আছে? গানগুলির নাট্য-উপযোগিতা বিচার করুন।

১০। ‘রক্তকরবী’ নাটকে পুরাণের ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখুন।

১১। ‘রক্তকরবী’ নাটকে প্রতীক ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১.৭। গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস - অজিতকুমার ঘোষ।

২। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী।

৩। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা - উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৪। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা - নীহাররঞ্জন রায়।

৫। রক্তকরবী: পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ - সম্পাদনা - প্রণয়কুমার কুন্ডু।

৬। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক - শঙ্খ ঘোষ।

৭। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ - শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়।

৮। নাটক ‘রক্তকরবী’ - শম্ভু মিত্র।

৯। রক্তকরবী অন্য ভাবনায় – সৌমিত্র বসু।

একক: ১২। রবীন্দ্র প্রবন্ধ: শকুন্তলা ও রাজসিংহ

বিন্যাসক্রম

১২.১। শকুন্তলা: মূল প্রবন্ধ পাঠ

১২.২। শকুন্তলা প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়

১২.৩। 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের প্রভাব

১২.৪। টেম্পেস্ট ও শকুন্তলার মধ্যে রবীন্দ্রসৃষ্ট প্রবন্ধে বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য প্রসঙ্গ

১২.৫। শকুন্তলা প্রবন্ধে স্বর্গ চ্যুতি থেকে স্বর্গপ্রাপ্তির বর্ণনা

১২.৬। রাজসিংহ: মূল প্রবন্ধ পাঠ

১২.৭। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের মত

১২.৮। অনুশীলনী

১২.৯। গ্রন্থপঞ্জি

১২.১। শকুন্তলা: মূল প্রবন্ধ পাঠ

শেক্সপীয়রের টেম্পেস্ট্ নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হইতে পারে। ইহাদের বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। নির্জনলালিতা মিরান্দার সহিত রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রণয় তাপসকুমারী শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয়ের অনুরূপ। ঘটনাস্থলটিরও সাদৃশ্য আছে; এক পক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, অপর পক্ষে তপোবন। এইরূপে উভয়ের আখ্যানমূলে ঐক্য দেখিতে পাই, কিন্তু কাব্যরসের স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারি। য়ুরোপের কবিকুলগুরু গেটে একটি মাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি

কাব্যকে খণ্ডখণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্‌ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে। অনেকেই এই কথাটি কবির উচ্ছ্বাসমাত্র মনে করিয়া লঘুভাবে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটামুটি মনে করেন, ইহার অর্থ এই যে, গেটের মতে শকুন্তলা কাব্যখানি অতি উপাদেয়। কিন্তু তাহা নহে। গেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি নহে, ইহা রসজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্‌ব আছে। কবি বিশেষভাবেই বলিয়াছেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি। মেঘদূতে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে, পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য পর্যটন করিয়া উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্যসৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম-অঙ্ক-বর্তী সেই মর্তের চঞ্চলসৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত-আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক। ইহা কেবল বিশেষ কোনো ভাবের অবতারণা নহে, বিশেষ কোনো চরিত্রের বিকাশ নহে, ইহা সমস্ত কাব্যকে এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাওয়া—প্রেমকে স্বভাবসৌন্দর্যের দেশ হইতে মঙ্গলসৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া। এই প্রসঙ্গটি আমরা অন্য একটি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। স্বর্গ ও মর্তের এই-যে মিলন, কালিদাস ইহা অত্যন্ত সহজেই করিয়াছেন। ফুলকে তিনি এমনই স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্তের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান কাহারো চোখে পড়ে না। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার পতনের মধ্যে কবি মর্তের মাটি কিছুই গোপন রাখেন নাই; তাহার মধ্যে বাসনার প্রভাব যে কতদূর বিদ্যমান, তাহা দুষ্মন্ত শকুন্তলা উভয়ের ব্যবহারেই কবি সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। যৌবনমত্ততার হাবভাব-লীলাচাঞ্চল্য, পরম লজ্জার সহিত প্রবল আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম, সমস্তই কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শকুন্তলার সরলতার নিদর্শন। অনুকূল অবসরে এই ভাবাবেশের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সে

পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল না। সে আপনাকে দমন করিবার, গোপন করিবার উপায় করিয়া রাখে নাই। যে হরিণী ব্যাধকে চেনে না তাহার কি বিদ্ধ হইতে বিলম্ব লাগে? শকুন্তলা পঞ্চশরকে ঠিকমত চিনিত না, এইজন্যই তাহার মর্মস্থান অরক্ষিত ছিল। সে না কন্দর্পকে, না দুষ্মন্তকে, কাহাকেও অবিশ্বাস করে নাই। যেমন, যে অরণ্যে সর্বদাই শিকার হইয়া থাকে, সেখানে ব্যাধকে অধিক করিয়া আত্মগোপন করিতে হয়, তেমনি যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের সর্বদাই সহজেই মিলন হইয়া থাকে সেখানে মীনকেতুকে অত্যন্ত সাবধানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাজ করিতে হয়। তপোবনের হরিণী যেমন অশঙ্কিত তপোবনের বালিকাও তেমনি অসতর্ক। শকুন্তলার পরাভব যেমন অতি সহজে চিত্রিত হইয়াছে তেমনি সেই পরাভবসত্ত্বেও তাহার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা, তাহার স্বাভাবিক অক্ষুণ্ন সতীত্ব, অতি অনায়াসেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাও তাহার সরলতার নিদর্শন। ঘরের ভিতরে যে কৃত্রিম ফুল সাজাইয়া রাখা যায় তাহার ধুলা প্রত্যহ না ঝাড়িলে চলে না, কিন্তু অরণ্যফুলের ধুলা ঝাড়িবার জন্য লোক রাখিতে হয় না; সে অনাবৃত থাকে, তাহার গায়ে ধুলাও লাগে, তবু সে কেমন করিয়া সহজে আপনার সুন্দর নির্মলতাটুকু রক্ষা করিয়া চলে। শকুন্তলাকেও ধুলা লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে নিজে জানিতেও পারে নাই; সে অরণ্যের সরলা মৃগীর মতো, নির্ঝরের জলধারার মতো, মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।

কালিদাস তাহাঁর এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নবযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাকে বাধা দেন নাই। আবার অন্য দিকে তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এক দিকে তরুলতাফলপুষ্পের ন্যায় সে আত্মবিস্মৃত স্বভাবধর্মের অনুগতা; আবার অন্য দিকে তাহার অন্তরতর নারীপ্রকৃতি সংযত, সহিষ্ণু, একাগ্রতপঃপরায়ণা, কল্যাণধর্মের শাসনে একান্ত নিয়ন্ত্রিতা। কালিদাস অপরূপ কৌশলে তাঁহার নায়িকাকে লীলা ও ধৈর্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহনার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার পিতা ঋষি, তাহার মাতা অপ্সরা; ব্রতভঙ্গে তাহার জন্ম, তপোবনে তাহার পালন। তপোবন স্থানটি এমন যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য এবং সংযম একত্র মিলিত হইয়াছে। সেখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান নাই, অথচ ধর্মের কঠোর নিয়ম

বিরাজমান। গান্ধর্ববিবাহ ব্যাপারটিও তেমনি; তাহাতে স্বভাবের উদ্দামতাও আছে, অথচ বিবাহের সামাজিক বন্ধনও আছে। বন্ধন ও অবন্ধনের সংগমস্থলে স্থাপিত হইয়াই শকুন্তলা নাটকটি একটি বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার সুখদুঃখ-মিলনবিচ্ছেদ সমস্তই এই উভয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে। গেটে যে কেন তাঁহার সমালোচনায় শকুন্তলার মধ্যে দুই বিসদৃশের একত্র সমাবেশ ঘোষণা ক রি য়াছেন তাহা অভিনিবেশপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায়।

টেম্পেস্টে এ ভাবটি নাই। কেনই বা থাকিবে? শকুন্তলাও সুন্দরী, মিরান্দাও সুন্দরী, তাই বলিয়া উভয়ের নাসাচক্ষুর অবিকল সাদৃশ্য কে প্রত্যাশা করিতে পারে? উভয়ের মধ্যে অবস্থার, ঘটনার, প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রভেদ। মিরান্দা যে নির্জনতায় শিশুকাল হইতে পালিত শকুন্তলার সে নির্জনতা ছিল না। মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্যে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইবার আনুকূল্য পায় নাই। শকুন্তলা সমানবয়সী সখীদের সহিত বর্ধিত; তাহারা পরস্পরের উত্তাপে, অনুকরণে, ভাবের আদান-প্রদানে, হাস্যে-পরিহাসে, কথোপকথনে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিতেছিল। শকুন্তলা যদি অহরহ কণ্বমুনির সঙ্গেই থাকিত তবে তাহার উন্মেষ বাধা পাইত, তবে তাহার সরলতা অজ্ঞতার নামান্তর হইয়া তাহাকে স্ত্রী-ঋষ্যশৃঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিত। বস্তুত শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত। উভয়ের মধ্যে অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাহাতে এইরূপই সংগত। মিরান্দার ন্যায় শকুন্তলার সরলতা অজ্ঞানের দ্বারা চর্তুদিকে পরিরক্ষিত নহে। শকুন্তলার যৌবন সদ্য বিকশিত হইয়াছে এবং কৌতুকশীলা সখীরা সে সম্বন্ধে তাহাকে আত্মবিস্মৃত থাকিতে দেয় নাই, তাহা আমরা প্রথম অঙ্কেই দেখিতে পাই। সে লজ্জা করিতেও শিখিয়াছে। কিন্তু এ-সকলেই বাহিরের জিনিস। তাহার সরলতা গভীরতর, তাহার পবিত্রতা অন্তরতর। বাহিরের কোন অভিজ্ঞতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কবি তা শেষ পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। শকুন্তলার সরলতা আভ্যন্তরিক। সে যে সংসারের কিছুই জানে না তাহা নহে; কারণ, তপোবন সমাজের একেবারে বর্হিবর্তী নহে; তপোবনেও গৃহধর্ম পালিত হইত। বাহিরের সম্বন্ধে শকুন্তলা অনভিজ্ঞ বটে, তবু অজ্ঞ নহে; কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের সিংহাসন। সেই

বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাহাকে ক্ষণকালের জন্য পতিত করিয়াছে, কিন্তু চিরকালের জন্য উদ্ধার করিয়াছে; দারুণতম বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতেও তাহাকে ধৈর্যে, ক্ষমায়, কল্যাণে স্থির রাখিয়াছে। মিরান্দার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, সংসারজ্ঞানের সহিত তাহার আঘাত ঘটে নাই; আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি, শকুন্তলাকে কবি প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। এমন স্থলে তুলনায় সমালোচনা বৃথা। আমরাও তাহা স্বীকার করি। এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া ওঠে। সেই বৈসাদৃশ্যের আলোচনাতেও দুই নাটককে পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার সহায়তা করিতে পারে। আমরা সেই আশায় এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

মিরান্দাকে আমরা তরঙ্গঘাতমুখর শৈলবন্ধুর জনহীন দ্বীপের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সেই দ্বীপপ্রকৃতির সঙ্গে তাহার কোনো ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার সেই আশৈশবধাত্রীভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিতে গেলে তাহার কোনো জায়গায় টান পড়িবে না। সেখানে মিরান্দা মানুষের সঙ্গ পায় নাই, এই অভাবটুকুই কেবল তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানকার সমুদ্র-পর্বতের সহিত তাহার অন্তঃকরণের কোনো ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না। নির্জন দ্বীপকে আমরা ঘটনাচ্ছলে কবির বর্ণনায় দেখি মাত্র, কিন্তু মিরান্দার ভিতর দিয়া দেখি না। এই দ্বীপটি কেবল কাব্যের আখ্যানের পক্ষেই আবশ্যক, চরিত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।

শকুন্তলা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের অ্যাখ্যানভাগ ব্যাঘাত পায় তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়। শকুন্তলা মিরান্দার মতো স্বতন্ত্র নহে, শকুন্তলা তাহার চতুর্দিকের সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত। তাহার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত, পশুপক্ষীদের অকৃত্রিম সৌহার্দের সহিত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট। কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য বলিতেছিলাম, শকুন্তলাকে তাহার কাব্যগত পরিবেষ্টন হইতে বাহির করিয়া আনা কঠিন।

ফার্দিনান্দের সহিত প্রণয়ব্যাপারেই মিরান্দার প্রধান পরিচয়; আর ঝড়ের সময় ভগ্নতরী হতভাগ্যদের জন্য ব্যাকুলতায় তাহার ব্যথিত হৃদয়ের করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। শকুন্তলার পরিচয় আরো অনেক ব্যাপক। দুষ্মন্ত না দেখা দিলেও তাহার মাধুর্য বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিত। তাহার হৃদয়লতিকা চেতন অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিতবেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে। সে তপোবনের তরুগুলিকে জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গে সোদরস্নেহে অভিষিক্ত করিয়াছে। সে নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎনাকে স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আপনার কোমল হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতেছে তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়। এই কাব্যে স্বভাব ও ধর্মনিয়মের যেমন মিলন, মানুষ ও প্রকৃতির তেমনি মিলন। বিসদৃশের মধ্যে এমন একান্ত মিলনের ভাব বোধ করি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে সম্ভবপর হইতে পারে না।

টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মানুষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে। মানুষের সঙ্গে তাহার অনিচ্ছুক ভৃত্যের সম্বন্ধ। সে স্বাধীন হইতে চায়, কিন্তু মানবশক্তিদ্বারা পীড়িত আবদ্ধ হইয়া দাসের মতো কাজ করিতেছে। তাহার হৃদয়ে স্নেহ নাই, চক্ষে জল নাই। মিরান্দার নারী হৃদয়ও তাহার প্রতি স্নেহ বিস্তার করে নাই। দ্বীপ হইতে যাত্রাকালে প্রস্পেরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের স্নিগ্ধ বিদায়সম্ভাষণ হইল না। টেম্পেস্টে পীড়ন, শাসন, দমন; শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি, সদ্‌ভাব। টেম্পেস্টে প্রকৃতি মানুষ-আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই; শকুন্তলায় গাছপালা-পশুপক্ষী আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে।

শকুন্তলার আরম্ভেই যখন ধনুর্বাণধারী রাজার প্রতি এই করুণ নিষেধ উত্থিত হইল ‘ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোহয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ', তখন কাব্যের একটি মূল সুর বাজিয়া উঠিল। এই নিষেধটি আশ্রমমৃগের সঙ্গে সঙ্গে তাপসকুমারী শকুন্তলাকেও করুণাচ্ছাদনে আবৃত করিতেছে। ঋষি বলিতেছেন-

মৃদু এ মৃগদেহে

মেরো না শর।

আগুন দেবে কে হে

ফুলের ‘পর।

কোথা হে মহারাজ,

মৃগের প্রাণ,

কোথায় যেন বাজ

তোমার বাণ।

এ কথা শকুন্তলা সম্বন্ধেও খাটে। শকুন্তলার প্রতিও রাজার প্রণয়শরনিক্ষেপ নিদারুণ। প্রণয়ব্যবসায়ে রাজা পরিপক্ক ও কঠিন—কত কঠিন, অন্যত্র তাহার পরিচয় আছে—আর, এই আশ্রমপালিতা বালিকার অনভিজ্ঞতা ও সরলতা বড়োই সুকুমার ও সকরুণ। হায়, মৃগটি যেমন কাতরবাক্যে রক্ষণীয়, শকুন্তলাও তেমনি। দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ।

মৃগের প্রতি এই করুণাবাক্যের প্রতিধ্বনি মিলাইতে না-মিলাইতে দেখি, বল্কল-বসনা তাপসকন্যা সখীদের সহিত আলবালে জলপূরণে নিযুক্ত, তরু-সোদর ও লতা-ভগিনীদের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক স্নেহসেবার কর্মে প্রবৃত্ত। কেবল বল্কলবসনে নহে, ভাবে ভঙ্গিতেও শকুন্তলা যেন তরুলতার মধ্যেই একটি। তাই দুষ্মন্ত বলিয়াছেন—

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা,

যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,

হৃদয়লোভনীয় কুসুম-হেন

তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।

নাটকের আরম্ভেই শান্তিসৌন্দর্যসংবলিত এমন একটি সম্পূর্ণ জীবন, নিভৃত পুষ্পপল্লবের মাঝখানে প্রাত্যহিক আশ্রমধর্ম, অতিথিসেবা, সখীস্নেহ ও বিশ্ববাৎসল্য লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল। তাহা এমনি অখণ্ড, এমনি আনন্দকর যে, আমাদের কেবলই আশঙ্কা হয়, পাছে আঘাত লাগিলেই ইহা ভাঙিয়া যায়। দুষ্মন্তকে দুই উদ্যত বাহু-দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, বাণ মারিয়ো না, মারিয়ো না—এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যটি ভাঙিয়ো না।

যখন দেখিতে দেখিতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছে তখন প্রথম অঙ্কের শেষে নেপথ্যে অকস্মাৎ আর্তরব উঠিল, 'ভো ভো তপস্বিগণ, তোমরা তপোবনপ্রাণীদের রক্ষার জন্য সতর্ক হও। মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত প্রত্যাসন্ন হইয়াছেন।'

ইহা সমস্ত তপোবনভূমির ক্রন্দন, এবং সেই তপোবনপ্রাণীদের মধ্যে শকুন্তলাও একটি। কিন্তু তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিল না।

সেই তপোবন হইতে শকুন্তলা যখন যাইতেছে, তখন কণ্ব ডাক দিয়া বলিলেন,

ওগো সন্নিহিত তপোবন-তরুগণ –

তোমাদের জল না করি দান

যে আগে জল না করিত পান,

সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু

স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু,

তোমাদের ফুল ফুটিত যবে

যে জন মাতিত মহোৎসবে,

পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,

তোমরা সকলে দেহ বিদায়।'

চেতন-অচেতন সকলের সঙ্গে এমনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, এমনি প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন! শকুন্তলা কহিল, ‘হলা প্রিয়ংবদে, আর্যপুত্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল, তবু আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে আমার পা যেন উঠিতেছে না।'

প্রিয়ংবদা কহিল, ‘তুমিই যে কেবল তপোবনের বিরহে কাতর, তাহা নহে, তোমর আসন্নবিয়োগে তপোবনেরও সেই একই দশা–

মৃগের গলি' পড়ে মুখের তৃণ,

ময়ূর নাচে না যে আর,

খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে

যেন সে আঁখিজলধার।'

শকুন্তলা কণ্বকে কহিল, ‘তাত, এই-যে কুটিরপ্রান্তচারিণী গর্ভমনথরা মৃগবধূ, এ যখন নির্বিঘ্নে প্রসব করিবে তখন সেই প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিবার জন্য একটি লোককে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়ো।'

কণ্ব কহিলেন, ‘আমি কখনো ভুলিব না।'

শকুন্তলা পশ্চাৎ হইতে বাধা পাইয়া কহিল, ‘আরে, কে আমার কাপড় ধরিয়া টানে?' কণ্ব কহিলেন,‘বৎসে–

ইঙ্গুদির তৈল দিতে স্নেহসহকারে

কুশক্ষত হলে মুখ যার,

শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে

এই মৃগ পুত্র সে তোমার।'

শকুন্তলা তাহাকে কহিল, ‘ওরে বাছা, সহবাসপরিত্যাগিনী আমাকে আর কেন অনুসরণ করিস? প্রসব করিয়াই তোর জননী যখন মরিয়াছিল তখন হইতে আমিই তোকে বড়ো

করিয়া তুলিয়াছি। এমন আমি চলিলাম, তাত তোকে দেখিবেন, তুই ফিরিয়া যা।' এইরূপে সমুদয় তরুলতা-মৃগপক্ষীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা তপোবন ত্যাগ করিয়াছে। লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই। বহিঃপ্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া, পর করিয়া ভাবে, যেখানে মানুষ আপনার চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না।

উত্তরচরিতেও প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাঁদিতেছে। সেখানে নদী তমসা ও বসন্তবনলক্ষ্মী তাঁহার প্রিয়সখী, সেখানে ময়ূর ও করীশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র, তরুলতা তাঁহার পরিজনবর্গ।

টেম্পেস্ট্ নাটকে মানুষ আপনাকে বিশ্বের মধ্যে মঙ্গলভাবে প্রীতিযোগে প্রসারিত করিয়া বড়ো হইয়া উঠে নাইবিশ্বকে খর্ব করিয়া, দমন করিয়া, আপনি অধিপতি হইতে চাহিয়াছে। বস্তুত আধিপত্য লইয়া দ্বন্দ্ববিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্টের মূলভাব। সেখানে প্রস্পেরো স্বরাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া মন্ত্রবলে প্রকৃতিরাজ্যের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। সেখানে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে কোনোমতে রক্ষা পাইয়া যে কয়জন প্রাণী তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও এই শূন্যপ্রায় দ্বীপের ভিতরে আধিপত্য লইয়া ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপনহত্যার চেষ্টা। পরিণামে তাহার নিবৃত্তি হইল,

কিন্তু শেষ হইল এ কথা কেহই বলিতে পারে না। দানবপ্রকৃতি ভয়ে শাসনে ও অবসরের অভাবে পীড়িত ক্যালিবানের মতো স্তব্ধ হইয়া রহিল মাত্র, কিন্তু তাহার দন্তমূলে ও নখাগ্রে বিষ রহিয়া গেল। যাহার যাহা প্রাপ্য সম্পত্তি সে তাহা পাইল। কিন্তু সম্পত্তিলাভ তো বাহ্যলাভ, তাহা বিষয়ীসম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইতে পারে, কাব্যের তাহা চরম পরিণামে নহে।

টেম্পেস্ট্ নাটকের নামও যেমন তাহার ভিতরকার ব্যাপারও সেইরূপ। মানুষে-প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে-মানুষে বিরোধ, এবং সে বিরোধের মূলে ক্ষমতালাভের প্রয়াস। ইহার আগাগোড়াই বিক্ষোভ।

মানুষের দুর্বাধ্য প্রবৃত্তি এইরূপ ঝড় তুলিয়া থাকে। শাসন-দমন পীড়নের দ্বারা এই-সকল প্রবৃত্তিকে হিংস্র পশুর মতো সংযত করিয়াও রাখিতে হয়। কিন্তু, এইরূপ বলের দ্বারা বলকে ঠেকাইয়া রাখা, ইহা কেবল একটা উপস্থিতমত কাজ চালাইবার প্রণালীমাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ইহাকেই পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, পাপ একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সংসারে তাহার সহস্র বাধাব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ্য একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্যসাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভালোকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রিয়, সে পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে। ফলাফলনির্ণয় ও বিভীষিকা-দ্বারা আমাদিগকে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা বাহিরের কাজ, তাহা দণ্ডনীতি ও ধর্মনীতির আলোচ্য হইতে পারে, কিন্তু উচ্চসাহিত্য অন্তরাত্মার ভিতরের পথটি অবলম্বন করিতে চায়; তাহা স্বভাবনিঃসৃত অশ্রুজলের দ্বারা কলঙ্কক্ষালন করে, আন্তরিক ঘৃণার দ্বারা পাপকে দগ্ধ করে এবং সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অভ্যর্থনা করে।

লিদাসও তাঁহার নাটকে দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহকে অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রুবর্ষণে নির্বাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাধিকে লইয়া অতিমাত্রায় আলোচনা করেন নাই; তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন এবং দিয়া তাহার উপরে একটি আচ্ছাদন টানিয়াছেন। সংসারে এরূপ স্থলে যাহা স্বভাবত হইতে পারিত তাহাকে তিনি দুর্বাসার শাপের দ্বারা ঘটাইয়াছেন। নতুবা তাহা এমন একান্তনিষ্ঠুর ও ক্ষোভজনক হইত যে, তাহাতে সমস্ত নাটকের শান্তি

ও সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া যাইত। শকুন্তলায় কালিদাস যে রসের প্রতি লক্ষ করিয়াছেন এরূপ অত্যুৎকট আন্দোলনে তাহা রক্ষা পাইত না। দুঃখবেদনাকে তিনি সমানই রাখিয়াছেন, কেবল বীভৎস কদর্যতাকে কবি আবৃত করিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস সেই আবরণের মধ্যে এতটুকু ছিদ্র রাখিয়াছেন যাহাতে পাপের আভাস পাওয়া যায়। সেই কথার উত্থাপন করি।

পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। সেই অঙ্কের আরম্ভেই কবি রাজার প্রণয়-রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য একটুখানি সরাইয়া দেখাইয়াছেন। রাজপ্রেয়সী হংসপদিকা নেপথ্য সংগীতশালায় আপন-মনে বসিয়া গাহিতেছেন-

নবমধুলোভী ওগো মধুকর,

চুতমঞ্জরী চুমি

কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ

কেমনে ভুলিলে তুমি?

রাজান্তঃপুর হইতে ব্যথিত হৃদয়ের এই অশ্রুসিক্ত গান আমাদিগকে বড়ো আঘাত করে। বিশেষ আঘাত করে এইজন্য যে, তাহার পূর্বেই শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রেমলীলা আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। ইহার পূর্ব অঙ্কেই শকুন্তলা ঋষিবৃদ্ধ কণেবর আশীর্বাদ ও সমস্ত অরণ্যানীর মঙ্গলাচরণ গ্রহণ করিয়া বড়ো স্নিগ্ধকরুণ, বড়ো পবিত্রমধুর ভাবে পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছে। তাহার জন্য যে প্রেমের, যে গৃহের চিত্র আমাদের আশাপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে, পরবর্তী অঙ্কের আরম্ভেই সে চিত্রে দাগ পড়িয়া যায়।

বিদূষক যখন জিজ্ঞাসা করিল ‘এই গানটির অক্ষরার্থ বুঝিলে কি', রাজা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,‘সকৃৎকৃতপ্রণয়োহয়ং জনঃ। আমারা একবার মাত্র প্রণয় করিয়া তাহার পরে ছাড়িয়া দিই, সেইজন্য দেবী বসুমতীকে লইয়া আমি ইহার মহৎ ভর্ৎসনের যোগ্য হইয়াছি। সখে মাধব্য, তুমি আমার নাম করিয়া হংসপদিকাকে বলো, বড়ো নিপুণভাবে

তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছ। ... যাও, বেশ নাগরিক বৃত্তিদ্বারা এই কথাটা তাঁহাকে বলিবে। '

পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।

চতুর্থ অঙ্ক হইতে পঞ্চম অঙ্কে আমরা হঠাৎ আর-এক বাতাসে আসিয়া পড়িলাম। এতক্ষণ আমরা যেন একটি মানসলোকে ছিলাম; সেখানকার যে নিয়ম এখানকার সে নিয়ম নহে। সেই তপোবনের সুর এখানকার সুরের সঙ্গে মিলিবে কী করিয়া? সেখানে যে ব্যাপারটি সহজ সুন্দরভাবে অতি অনায়াসে ঘটিয়াছিল এখানে তাহার কী দশা হইবে, তাহা চিন্তা করিলে আশঙ্কা জন্মে। তাই পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই নাগরিকবৃত্তির মধ্যে যখন দেখিলাম যে, এখানে হৃদয় বড়ো কঠিন, প্রণয় বড়ো কুটিল, এবং মিলনের পথ সহজ নহে, তখন আমাদের সেই বনের সৌন্দর্যস্বপ্ন ভাঙিবার মতো হইল। ঋষিশিষ্য শার্ঙ্গরব রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, ‘যেন অগ্নিবেষ্টিত গৃহের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। ' শারদ্বত কহিলেন, ‘তৈলাক্তকে দেখিয়া স্নাত ব্যক্তির, অশুচিকে দেখিয়া শুচি ব্যক্তির, সুপ্তকে দেখিয়া জাগ্রত জনের, এবং বদ্ধকে দেখিয়া স্বাধীন পুরুষের যে ভাব মনে হয়, এই-সকল বিষয়ী লোককে দেখিয়া আমার সেইরূপ মনে হইতেছে। ' একটা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন ঋষিকুমারগণ তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন। পঞ্চম অঙ্কের আরম্ভে কবি নানাপ্রকার আভাসের দ্বারা আমাদিগকে এই ভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন, যাহাতে শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানব্যাপার অকস্মাৎ অতিমাত্র আঘাত না করে। হংসপদিকার সরল করুণ গীত এই ক্রুরকাণ্ডের ভূমিকা হইয়া রহিল। তাহার পরে প্রত্যাখ্যান যখন অকস্মাৎ বজ্রের মতো শকুন্তলার মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িল তখন এই তপোবনের দুহিতা বিশ্বস্ত হস্ত হইতে বাণাহত মৃগীর মতো বিস্ময়ে ত্রাসে বেদনায় বিহ্বল হইয়া ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া রহিল। তপোবনের পুষ্পরাশির উপর অগ্নি আসিয়া পড়িল। শকুন্তলাকে অন্তরে-বাহিরে ছায়ায়-সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন করিয়া যে-একটি তপোবন লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছিল এই বজ্রাঘাতে তাহা শকুন্তলার চতুর্দিক হইতে চিরদিনের

জন্য বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল; শকুন্তলা একেবারে অনাবৃত্ত হইয়া পড়িল। কোথায় তাত কণ্ব, কোথায় মাতা গৌতমী, কোথায় অনসূয়া-প্রিয়ংবদা, কোথায় সেই-সকল তরুলতা-পশুপক্ষীর সহিত স্নেহের সম্বন্ধ, মাধুর্যের যোগ—সেই সুন্দর শান্তি, সেই নির্মল জীবন! এই এক মুহূর্তের প্রলয়াভিঘাতে শকুন্তলার যে কতখানি বিলুপ্ত হইয়া গেল তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। নাটকের প্রথম চারি অঙ্কে যে সংগীতধ্বনি উঠিয়াছিল তাহা এক মুহূর্তেই নিঃশব্দ হইয়া গেল।

তাহার পরে শকুন্তলার চতুর্দিকে কী গভীর স্তব্ধতা, কী বিরলতা। যে শকুন্তলা কোমল হৃদয়ের প্রভাবে তাহার চারি দিকের বিশ্ব জুড়িয়া সকলকে আপনার করিয়া থাকিত সে আজ কী একাকিনী। তাহার সেই বৃহৎ শূন্যতাকে শকুন্তলা আপনার একমাত্র মহৎ দুঃখের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কালিদাস যে তাহাকে কণ্বের তপোবনে ফিরাইয়া লইয়া যান নাই, ইহা তাঁহার অসামান্য কবিত্বের পরিচয়। পূর্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্বের মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদমাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্মন্তভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল; সে শকুন্তলা আর রহিল না, এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ-পরিবর্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইত। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপবাসী বিরলতা আবশ্যক। সখীবিহীন নূতন তপোবনে কালিদাস শকুন্তলার বিরহদুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই।

কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারি দিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। কবি যদি শকুন্তলাকে কণ্বাশ্রমের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া এইরূপ চুপ করিয়াও থাকিতেন, তবু সেই আশ্রম কথা কহিত। সেখানকার তরুলতার ক্রন্দন, সখীজনের বিলাপ, আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকিত। কিন্তু অপরিচিত মারীচের তপোবনে সমস্তই আমাদের নিকট স্তব্ধ, নীরব; কেবল বিশ্ববিরহিত শকুন্তলার নিয়মসংযত ধৈর্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান। এই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন

ওষ্ঠাধরের উপরে তর্জনী স্থাপন করিয়াছেন, এবং সেই নিষেধের সংকেতে সমস্ত প্রশ্নকে নীরব ও সমস্ত বিশ্বকে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

দুষ্মন্ত এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন। এই অনুতাপ তপস্যা। এই অনুতাপের ভিতর দিয়া শকুন্তলাকে লাভ না করিলে শকুন্তলা-লাভের কোনো গৌরব ছিল না। হাতে পাইলেই যে পাওয়া তাহা পাওয়া নহে; লাভ করা অত সহজ ব্যাপার নয়। যৌবনমত্ততার আকস্মিক ঝড়ে শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উড়াইয়া লইলে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাইত না। লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। যাহা অনায়াসেই হস্তগত হইয়াছিল তাহা অনায়াসেই হারাইয়া গেল। যাহা আবেশের মুষ্টিতে আহৃত হয় তাহা শিথিলভাবেই স্খলিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য কবি পরস্পরকে যথার্থভাবে চিরন্তনভাবে লাভের জন্য দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দীর্ঘ দুঃসহ তপস্যায় প্রবৃত্ত করিলেন। রাজসভায় প্রবেশ করিবামাত্র দুষ্মন্ত, যদি তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতেন তবে শকুন্তলা হংসপদিকার দলবৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অবরোধের এক প্রান্তে স্থান পাইত। বহুবল্লভ রাজার এমন কত সুখলব্ধ প্রেয়সী ক্ষণকালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু মাত্র লইয়া অনাদরের অন্ধকারে অনাবশ্যক জীবন যাপন করিতেছে। সকৃৎকৃতপ্রণয়োহয়ং জনঃ। শকুন্তলার সৌভাগ্যবশতই দুষ্মন্ত নিষ্ঠুর কঠোরতার সহিত তাহাকে পরিহার করিয়াছিলেন। নিজের উপর নিজের সেই নিষ্ঠুরতার প্রত্যাভিঘাতেই দুষ্মন্তকে শকুন্তলা সম্বন্ধে আর অচেতন থাকিতে দিল না। অহরহ পরমবেদনার উত্তাপে শকুন্তলা তাঁহার বিগলিত হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল, তাঁহার অন্তর-বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া দিল। এমন অভিজ্ঞতা রাজার জীবনে কখনো হয় নাই, তিনি যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই। রাজা বলিয়া এ সম্বন্ধে তিনি হতভাগ্য। ইচ্ছা তাঁহার অনায়াসেই মিটে বলিয়াই সাধনার ধন তাঁহার অনায়ত্ত ছিল। এবারে বিধাতা কঠিন দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া রাজাকে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন; এখন হইতে তাঁহার নাগরিকবৃত্তি একেবারে বন্ধ।

এইরূপে কালিদাস পাপকে হৃয়ের ভিতর দিক হইতে আপনার অনলে আপনি দগ্ধ করিয়াছেন; বাহির হইতে তাহাকে ছাইচাপা দিয়া রাখেন নাই। সমস্ত অমঙ্গলের নিঃশেষে অগ্নিসৎকার করিয়া তবে নাটকখানি সমাপ্ত হইয়াছে; পাঠকের চিত্ত একটি সংশয়হীন

পরিপূর্ণ পরিণতির মধ্যে শান্তি লাভ করিয়াছে। বাহির হইতে অমস্মাৎ বীজ পড়িয়া যে বিষবৃক্ষ জন্মে ভিতর হইতে গভীরভাবে তাহাকে নির্মূল না করিলে তাহার উচ্ছেদ হয় না। কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বাহিরের মিলনকে দুঃখখনিত পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভ্যন্তরের মিলনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্য কবি গেটে বলিয়াছেন, তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত এবং স্বর্গ যদি কেহ একাধারে পাইতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাওয়া যাইবে।

টেম্পেস্টে ফার্দিনান্দের প্রেমকে প্রস্পেরো কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে বাহিরের ক্লেশ। কেবল কাঠের বোঝা বহন করিয়া পরীক্ষার শেষ হয় না। আভ্যন্তরিক কী উত্তাপে ও পেষণে অঙ্গার হীরক হইয়া উঠে কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি কালিমাকে নিজের ভিতর হইতেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি ভঙ্গুরতাকে চাপ-প্রয়োগে দৃঢ়তা দান করিয়াছেন। শকুন্তলায় আমরা অপরাধের সার্থকতা দেখিতে পাই; সংসারে বিধাতার বিধানে পাপও যে কী মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত আছে কালিদাসের নাটকে আমরা তাহার সুপরিণত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অপরাধের অভিঘাত ব্যতীত মঙ্গল তাহার শাশ্বত দীপ্তি ও শক্তি লাভ করে না।

শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের আরম্ভে একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে দেখিলাম; সেখানে সরল আনন্দে সে আপন সখীজন ও তরুলতামৃগের সহিত মিশিয়া আছে। সেই স্বর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে অপরাধ আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং স্বর্গসৌন্দর্য কীটদষ্ট পুষ্পের ন্যায় বিদীর্ণ স্রস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পরে লজ্জা, সংশয়, দুঃখ, বিচ্ছেদ, অনুতাপ। এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধতর উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি। শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।

প্রথম স্বর্গটি বড়ো মৃদু এবং অরক্ষিত; যদিও তাহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে শিশিরের মতো তাহা সদ্যঃপাতী। এই সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার সৌকুমার্য হইতে মুক্তি পাওয়াই ভালো, ইহা চিরদিনের নহে এবং ইহাতে আমাদের সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি নাই। অপরাধ মত্ত গজের ন্যায় আসিয়া এখানকার পদ্মপত্রের বেড়া ভাঙিয়া দিল, আলোড়নের বিক্ষোভে সমস্ত চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সহজ স্বর্গ এইরূপে সহজেই নষ্ট হইল, বাকি

রহিল সাধনার স্বর্গ। অনুতাপের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সেই স্বর্গ যখন জিত হইল তখন আর কোনো শঙ্কা রহিল না। এ স্বর্গ শাশ্বত।

মানুষের জীবন এইরূপ—শিশু যে সরল স্বর্গে থাকে তাহা সুন্দর, তাহা সম্পূর্ণ, কিন্তু ক্ষুদ্র। মধ্যবয়সের সমস্ত বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ, সমস্ত অপরাধের আঘাত ও অনুতাপের দাহ, জীবনের পূর্ণবিকাশের পক্ষে আবশ্যক। শিশুকালের শান্তির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সংসারের বিরোধবিপ্লবের মধ্যে না পড়িলে পরিণতবয়সের পরিপূর্ণ শান্তির আশা বৃথা। প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ করিয়া তবেই সায়াহ্নের লোকলোকান্তরব্যাপী বিরাম। পাপে-অপরাধে ক্ষণভঙ্গুরকে ভাঙিয়া দেয় এবং অনুতাপে-বেদনায় চিরস্থায়ীকে গড়িয়া তোলে। শকুন্তলা-কাব্যে কবি সেই স্বর্গচ্যুতি হইতে স্বর্গপ্রাপ্তি পর্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বাহিরে প্রশান্ত সুন্দর, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড শক্তি অহরহ অভ্যন্তরে কাজ করে, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকখানির মধ্যে আমরা তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাই। এমন আশ্চর্য সংযম আমরা আরে কো নো নাটকেই দেখি নাই। প্রবৃত্তির প্রবলতাপ্রকাশের অবসরমাত্র পাইলেই য়ুরোপীয় কবিগণ যেন উদ্দাম হইয়া উঠেন। প্রবৃত্তি যে কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে তাহা অতিশয়োক্তিদ্বারা প্রকাশ করিতে তাঁহারা ভালোবাসেন। শেক্‌স্‌পীয়রের রোমিয়ো-জুলিয়েট প্রভৃতি নাটকে তাহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত-গভীর, এমন সংযত-সম্পূর্ণ নাটক শেক্‌স্‌ পীয়রের নাট্যবলীর মধ্যে একখানিও নাই। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মধ্যে যেটুকু প্রেমালাপ আছে, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তাহার অধিকাংশই আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, কালিদাস কোথাও রাশ আলগা করিয়া দেন নাই। অন্য কবি যেখানে লেখনীকে দৌড় দিবার অবসর অন্বেষণ করিত তিনি সেখানেই তাহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিয়াছেন। দুষ্মন্ত তপোবন হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া শকুন্তলার কোনো খোঁজ লইতেছেন না। এই উপলক্ষে বিলাপ-পরিতাপের কথা অনেক হইতে পারিত, তবু শকুন্তলার মুখে কবি একটি কথাও দেন নাই। কেবল দুর্বাসার প্রতি আতিথ্যে অনবধান লক্ষ্য করিয়া হতভাগিনীর অবস্থা আমরা যথাসম্ভব কল্পনা করিতে পারি। শকুন্তলার প্রতি কণ্বের একান্ত স্নেহ বিদায়কালে কী সকরুণ গাম্ভীর্য ও সংযমের সহিত কত অল্প কথাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার

সখীবিচ্ছেদবেদনা ক্ষণে ক্ষণে দুটি-একটি কথায় যেন বাঁধ লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া তখনি আবার অন্তরের মধ্যে নিরস্ত হইয়া যাইতেছে। প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে ভয়, লজ্জা, অভিমান, অনুনয়, ভর্ৎসনা, বিলাপ, সমস্তই আছে, অথচ কত অল্পের মধ্যে। যে শকুন্তলা সুখের সময় সরল অসংশয়ে আপনাকে বিসর্জন দিয়াছিল, দুঃখের সময় দারুণ অপমানকালে সে যে আপন হৃদয়বৃত্তির অপ্রগল্‌ভ মর্যাদা এমন আশ্চর্য সংযমের সহিত রক্ষা করিবে, এ কে মনে করিয়াছিল? এই প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী নীরবতা কী ব্যাপক, কী গভীর! কণ্ব নীরব, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নীরব, মালিনীতীরতপোবন নীরব, সর্বাপেক্ষা নীরব শকুন্তলা। হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়ন করিয়া তুলিবার এমন অবসর কি আর-কোনো নাটকে এমন নিঃশব্দে উপেক্ষিত হইয়াছে? দুষ্মন্তের অপরাধকে দুর্বাসার শাপের আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখা, সেও কবির সংযম। দুষ্টপ্রবৃত্তির দুরন্তপনাকে অবারিতভাবে উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার যে প্রলোভন তাহাও কবি সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন –

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোহয়মস্মিন্

মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।

দুষ্মন্ত যখন কাব্যের মধ্যে বিপুল বিক্ষোভের কারণ লইয়া মত্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন তখন কবির অন্তরের মধ্যে এই ধ্বনি উঠিল–

মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো

ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ।

তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নের ন্যায় গজরাজ ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এইবার বুঝি কাব্যের শান্তিভঙ্গ হয়। কালিদাস তখনই ধর্মারণ্যের, কাব্যকাননের, এই মূর্তিমান বিঘ্নকে শাপের বন্ধনে সংযত করিলেন; ইহাকে দিয়া তাঁহার পদ্মবনের পঙ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিতে দিলেন না।

য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন; সংসারে ঠিক যেমন নাটকে তাহাই ঘটাইতেন। শাপ বা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা কিছুই আবৃত করিতেন না। যেন তাঁহাদের 'পরে সমস্ত দাবি কেবল সংসারের, কাব্যের কোনো দাবি নাই। কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই; পথে-ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে নকল করিতেই হইবে, এমন দাসখত তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই- কিন্তু কাব্যের শাসন কবিকে মানিতেই হইবে। কাব্যের প্রত্যেক ঘটনাটিকে সমস্ত কাব্যের সহিত তাঁহাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেই হইবে। তিনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তিকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া সত্যের বাহ্যমূর্তিকে তাঁহার কাব্যসৌন্দর্যের সহিত সংগত করিয়া লইয়াছেন। তিনি অনুতাপ ও তপস্যাকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু পাপকে তিরস্করণীর দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। শকুন্তলা নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে-একটি শান্তি সৌন্দর্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এরূপ না করিলে তাহা বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। সংসারের নকল ঠিক হইত, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী সুকঠোর আঘাত পাইতেন। কবি কালিদাসের করুণনিপুণ লেখনীর দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হইত না।

কবি এইরূপে বাহিরের শান্তি ও সৌন্দর্যকে কোথাও অতিমাত্র ক্ষুব্ধ না করিয়া তাঁহার কাব্যের আভ্যন্তরিক শক্তিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে সর্বদা সক্রিয় ও সবল করিয়া রাখিয়াছেন। এমন-কি, তাঁহার তপোবনের বহিঃপ্রকৃতিও সর্বত্র অন্তরের কাজেই যোগ দিয়াছে। কখনো বা তাহা শকুন্তলার যৌবনলীলায় আপনার লীলামাধুর্য অপর্ণ করিয়াছে, কখনো বা মঙ্গল-আশীর্বাদের সহিত আপনার কল্যাণমর্মর মিশ্রিত করিয়াছে, কখনো বা বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতার সহিত আপনার মূক বিদায়বাক্যে করুণা জড়িত করিয়া দিয়াছে এবং অপরূপ মন্ত্রবলে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে একটি পবিত্র নির্মলতা—একটি স্নিগ্ধ মাধুর্যের রশ্মি নিয়ত বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এই শকুন্তলা কাব্যে নিস্তব্ধতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে নিস্তব্ধভাবে অথচ ব্যাপকভাবে কবির তপোবন এই কাব্যের মধ্যে কাজ করিয়াছে। সে কাজ টেম্পেস্টের এরিয়েলের ন্যায় শাসনবদ্ধ দাসত্বের বাহ্য কাজ নহে; তাহা সৌন্দর্যের কাজ, প্রীতির কাজ, আত্মীয়তার কাজ, অভ্যন্তরের নিগূঢ় কাজ।

টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি; টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি; টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসাদ। টেম্পেস্টের মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতার উপরে। শকুন্তলার সরলতা অপরাধে, দুঃখে, অভিজ্ঞতায়, ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ক গম্ভীর ও স্থায়ী। গেটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি, শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্তকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।

১২.২। শকুন্তলা প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়

আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বন্তব্যটি হচ্ছে মোটামুটিভাবে এই প্রকার:

(ক) শেকসপীয়রের টেম্পেস্ট নাটক এবং কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটক- এদুটি নাটকের নায়িকা, আখ্যান এবং পটভূমিকার মধ্যে যদিও কিছুটা আপাতদৃশ্য সাদৃশ্য নজরে পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু নাটক দুখানিকে পাশাপাশি রেখে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি।

(খ) সাদৃশ্যের মধ্যে এইটুকুই যে, দু-নাটকেরই নায়িকা মিরান্দা এবং শকুন্তলার সাধারণ লোকালয় থেকে অন্তরিত এক-একটি নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে লালিত যাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই এই নায়িকা দুজনের মনে গাঢ় প্রেমের বীজ উপ্ত হয়েছিল। অতঃপর উপ্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গমে নায়কদের সঙ্গে তাদের গাঢ়তর প্রণয় এবং সেই প্রণয়ের পরিণামে স্ব-স্ব প্রেমিকের সঙ্গে তাদের মিলন তথা পরিণয়।

(গ) এই আপাত সাদৃশ্যটুকু বাদ দিলে শকুন্তলা এবং মিরান্দা অবশিষ্ট আর সব ব্যাপারেই কেবল পরস্পরের বিসদৃশ নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে পরস্পরের বিপরীত এই বৈসাদৃশ্য এবং বৈপরীত্যের বিস্তারিত বিশ্লেষণই হচ্ছে 'শকুত্তলা'-প্রবন্ধের শুধু মূল নয়-সমগ্র উপজীব্য।

(ঘ) বিস্তৃত বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে গেটে শকুন্তলা-নাটকের মূল্যায়ন করেছিলেন শুধু একটি মাত্র শ্লোকে- "কেউ যদি তরুণ বয়সের ফুল ও পরিণত বয়সের

ফল এবং মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখতে চায় তবে তা সে শকুন্তলায় পাবে।" গ্যেটের এই উক্তিকে যথার্থ রসজ্ঞের বিচার রুপে অভিহিত এবং গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গ্যেটের এই উক্তির পটভূমির নিরিখেই টেম্পেস্ট ও শকুন্তলার যে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্যগুলিকে নির্দেশিত করেছেন; সেগুলি হচ্ছে মোটামুটি নিম্নবিধ:

শেক্সপীয়ের 'টেম্পেস্ট' নাটকের সঙ্গে কালিদাসের নাটক শকুন্তলার তুলনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-ওই দুই নাটকের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য এবং কিছু অনৈক্যের কথা বলেছেন। সাদৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বাহ্য সাদৃশ্যের কথাই বেশি করে বলেছেন। টেম্পেস্টের নায়িকা একটি দ্বীপে পিতার স্নেহাশ্রয়ে লালিতপালিত, সেই দ্বীপের নির্জনতায় তার চরিত্রের বিকাশ ; শকুন্তলাও লোকালয় বর্জিত অরণ্যের মধ্যে এক তপোবনে লালিত। সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের সঙ্গে অরণ্যমধ্যের আশ্রমের সাদৃশ্য আছে। মিরান্দা দ্বীপের নির্জনতায় মানুষ, আশ্রমে শকুন্তলা তার দুই সখী অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদার সাহচর্য বড়ো হয়ে উঠেছে, কিন্তু অরণ্যপ্রকৃতির প্রভাব মিরান্দা এবং শকুন্তলা কেউই এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাছাড়া দুষ্যন্ত আশ্রমে এসে শকুন্তলার প্রতি মুগ্ধ হয়; বলা বাহুল্য, শকুন্তলাও রাজার প্রতি আসন্ত হয়। অনুরুপভাবে না হলেও ঘটনাচক্রে ফার্দিনান্দ দ্বীপে আসার পর মিরান্দার প্রতি তারও আসক্তি জন্মায় এবং মিরান্দাও ফার্দিনান্দকে ভালোবাসে । সাদৃশ্য এইটুকু।

কিন্তু বৈসাদৃশ্য অনেক বেশি। টেম্পেস্টে এবং শকুন্তলা নাটকের বক্তব্য শুধু দুটি নরনারীর মিলনের কথাই নয়, বিশেষ করে শকুন্তলার ত' নয়ই। শকুন্তলার মধ্যে মিলনের কথাই শুধু ব্যক্ত হয়নি। টেম্পেস্ট নাটকে মিরান্দা এবং ফার্দিনান্দের মিলনই মুখ্য ঘটনা, শকুন্তলায় দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলনের মাধ্যমে লেখক শ্রেয়োবোধের একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির কথা আছে। সে পরিণতি ফুল থেকে ফলে, মর্ত্য থেকে স্বর্গে, স্বভাব থেকে ধর্মে পরিণতি ।

শকুন্তলার পতন প্রথম অঙ্কেই দেখা গেছে। যৌবনমত্ততার লীলাচাঞ্চল্য, পরম লজ্জার সঙ্গে আত্মপ্রকাশের ভাব সবই প্রথম অঙ্কে ব্যক্ত; শকুন্তলা যে কত সরল এবং পবিত্র - তাও এই অঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে দুষ্যন্তের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে শেখেনি,

তপোবনে হরিণী যেমন ব্যাধকে জানতে পারে না, সর্বদা নিঃশঙ্ক থাকে, শকুন্তলাও তেমনি অসতর্ক থেকে গেছে।

শকুন্তলা আশ্রমেরই অঙ্গীভূত, আশ্রমের গাছপালা বা প্রাণীর মতোই সে তপোবনের অংশবিশেষ। তপোবনের গাছপালায় জলসেচন করার সময় শকুন্তলা নিজেকে তাদের আত্মীয় ভেবেছে, বন জ্যোৎস্নাকে সে নিজের অন্তরে গ্রহণ করেছে। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করছে, তখন বোঝা যায় - তার সঙ্গে বন প্রকৃতির

নিবিড় নৈকট্য কতখানি গভীর ও আন্তরিক।

টেম্পেস্টে এ ভাব নেই। মিরান্দার হৃদয়ে কারুণ্য আছে, দ্বীপের প্রকৃতির সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেনি। ঝড়ে ভগ্নতরী-হতভাগ্যদের প্রতি করুণায় সে ব্যথিত বোধ করেছে। তার বাবা ফার্দিনান্দকে যখন অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছেন, তখনও মিরান্দার কারুণ্য জেগেছে।

মিরান্দার সঙ্গে শকুন্তলার পার্থক্য আরও আছে। মিরান্দাকে দ্বীপ প্রকৃতি থেকে তুলে নিলে তার হৃদয়ে টান পড়বে না; কিন্তু শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত, সে তপোবন-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিকভাবে জড়িত। আর একটি বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করতে হবে। শকুন্তলা আশ্রমে সমবয়সী সখীদ্বয়ের সাহচর্যে, আশ্রমের জীবনাচর্যে লালিতপালিত; মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্য বড়ো হয়ে উঠেছে, তার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি । শকুন্তলা সমানবয়সী সখীদের সঙ্গে কথাবার্তায়, হাসিঠাট্টায়, ভাবের আদান-প্রদানে মানুষ । ফলে উভয়ের চরিত্রের সরলতা একদেশী নয়, শকুন্তলার সারল্য স্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত। শকুন্তলার যৌবনাগমকে সখীরা সতর্ক করেছে, তাই শকুন্তলা লজ্জা করতে শিখেছে। মিরান্দার ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি।

শকুন্তলা সরল বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখেছে, চরম বিশ্বাসঘাতকতার মুহূর্তেও সে নিজেকে স্থির রাখতে পেরেছে। মিরান্দার কিন্তু এরকম পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হয়নি, সংসারজ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো সংঘাত ঘটেনি । তাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্যই বেশি।

শকুন্তলাকে প্রকৃতির অংশ করে অঙ্কিত করা হয়েছে, তপোবন ত্যাগ করে পৃতিগৃহে যাত্রাকালে প্রকৃতি বিধুর হয়ে ওঠে, বেদনা বোধ করে। মিরান্দা দ্বীপপ্রকৃতির সঙ্গে তেমন একান্ত হতে পারে নি, সেখানকার সমুদ্র-পর্বতের সঙ্গে তার কোনো ভাবাত্মক যোগ হয় নি। টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতির রূপক হিসেবে যদিও এরিয়েলের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তবু মানুষের সঙ্গে সেই প্রকৃতির কোনো যোগসাধন ঘটেনি। দ্বীপ থেকে চলে যাবার সময় মিরান্দা বা প্রস্পেরোর কোনো বিদায় সম্ভাষণ হয় নি এরিয়েলের সঙ্গে। টেম্পেস্টে শুধু পীড়, শাসন, দমন আর শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি এবং সদ্ভাব।

আশ্রমমৃগের মতোই শকুন্তলা তপোবনের অংশীভূত। লতার সঙ্গে ফুলের যে সম্পর্ক, এই বনপ্রকৃতি ও তপোবনের সঙ্গে শকুন্তলার সেই রকম স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

টেম্পেস্ট নাটকে প্রকৃতি এমনভাবে মানুষের আত্মীয় হয়ে ওঠেনি। মানুষ সেখানে প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করতে চেয়েছে। টেম্পেস্ট নাটকের নামটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে এখানে মানুষে-প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে-মানুষে বিরোধ । মানুষ শক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে দমন করতে চাইছে; শকুন্তলায় এই শক্তির বা দম্ভের প্রাবল্য দেখানো হয় প্রবৃত্তির কথাও বেশি বলা হয়নি, আভাসে ইঙ্গিতে প্রবৃত্তির কথা বলার পরই শ্রেয়োবোধের পথের ইঙ্গিত দেখানো হয়েছে। রাজসভায় পতিদ্বারা প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলার কোনো অভিযোগ নেই, সে ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা কল্যাণবোধের দ্বারা শ্রেয়োলাভে ব্রতী হয়েছে। মিরান্দাকে প্রেমের ক্ষেত্রে এমন পরীক্ষা দিতে হয় নি, ফাদিনান্দ মিরান্দাকে কতদূর ভালোবাসে তা পরখ করার জন্যে প্রস্পেরো যখন ফার্দিনান্দের কৃচ্ছসাধন করাচ্ছিলেন, তখন ফার্দিনান্দের জন্যে মিরান্দার বোধ ছিল এই মাত্র।

টেম্পেস্টে শক্তির লীলা দেখা যায়, শকুন্তলায় আছে কল্যাণের প্রশান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। তাই মিরান্দা সরল মাধূর্যে গঠিত হয়েও সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ রয়ে গেছে, পক্ষান্তরে শকুন্তলার সরলতা অপরাধে দুঃখে অভিজ্ঞতায় স্থায়িত্বলাভ করেছে। শকুন্তলায় আরম্ভ আছে, পরিণতিও; টেম্পেস্টে আরম্ভের যে সুর, পরিণতিও সেই দিকে। প্রেম থেকে শ্রেয়ে উত্তরণ শুধু শকুন্তলার চরিত্রেই দেখা যায়। এইখানেই এই দুই নায়িকা চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য।

১২.৩। 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথ ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থে কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে কালিদাসের সৌন্দর্যসাধনা এবং প্রেমকল্পনার মূল তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছেন। তিনি ওই প্রবন্ধে ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ নাটকের বিশ্লেষণাত্বক আলোচনা করেননি, বরং সাংশ্লেষণিক আলোচনার দ্বারা কালিদাসের নাটকের দু একটি বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। যে প্রেমের পরিণামে কোনো মাঙ্গল্য নেই যে সৌন্দর্যে কল্যাণের স্পর্শ নেই সেই প্রেম, সেই সৌন্দর্য নিরথক। প্রেমের উদ্দেশ্য যদি শুধু ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা হয়, সৌন্দর্য যদি শুধু ভোগপিপাসাকে বাড়িয়ে দেয় তবে তা কল্যাণকর হয় না, এবং প্রাচীন ভারতবর্ষে এই জাতীয় প্রেম ও সৌন্দর্যকে গ্রহণীয় বিবেচনা করা হয় নি। প্রেম ত্যাগের মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল না হলে সে প্রেম কল্যাণপ্রদ হয় না। শকুন্তলা নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রানাথ এই বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

শকুন্তলা নাটকে প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ রুপায়িত হয়েছে। দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা প্রথম দর্শনে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে এবং গোপন মিলনের দ্বারা আশ্রমের পবিত্রতাকে ক্ষুন্ন করে। তাদের এই প্রেম কামনা-বাসনারই ফল, এখানে ধর্ম বা কল্যাণবোধ ছিল না; তাই সেই প্রেমে দুর্বাসার অভিশাপ নেমে এল। প্রেমের সঙ্গে যদি ধর্মের মেল বন্ধন না ঘটে, তবে সেই প্রেমে কল্যাণপরিণতি থাকে না সে প্রেম দেহসর্বস্ব। কিন্তু যে প্রেম ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই প্রেমে কল্যাণবোধ জাগ্রত থাকে, শ্রেয়োবোধে সে প্রেম উজ্জীবিত হয়।

শকুন্তলা নাটকে এই বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের কথা বলেছেন। এই নাটকের সঙ্গে শকুন্তলা নাটকের কিছু সাদৃশ্য এবং কিছু বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছেন। টেম্পেস্টে নায়ক-নায়িকার জীবনবৃত্ত খণ্ডিত, প্রাত্যহিক ও সাংসারিক জীবনের স্বাভাবিক প্রেমের ছবি সেখানে দেখা গেছে। কিন্তু কালিদাসের দেখানো প্রেমে

একটি পরিণামের সন্ধান পাওয়া যায়, দুঃখ ও বিরহের মধ্যে দিয়ে তপস্যা ও শুচিতার মাধ্যমে প্রেমের মঙ্গলতীর্থে উন্নীত করা হয়েছে। শকুন্তলা নাটকের এই এক বড়ো বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের মতে শকুন্তলা এই গভীর জীবনবোধের নাটক। এখানে প্রেম কল্যাণশক্তিতে উন্নীত। এখানে নায়িকা শুধু প্রেয়সী নয়, শ্রেয়সী। এই জন্যে রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলেছেন।

শকুন্তলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের শিল্প-সংযমের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। ইউরোপীয় শিল্পে প্রবৃত্তির অনাবৃত প্রকাশ থাকে, কালিদাস কিন্তু সর্বত্র সংযম রক্ষা করেছেন।

এছাড়া শকুন্তলা নাটকের আর-একটি বৈশিষ্ট্যের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্কটি শকুন্তলা নাটকে মূর্ত হয়েছে। জড় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা যে কতদূর নিবিড় হতে পারে তা দেখানো হয়েছে। মূক প্রকৃতি আর মনুষ্য সমাজের মধ্যে প্রীতির এমন যোগ বিশ্বের আর কোনো সাহিত্যে দেখা যায় না।

১২.৪। টেম্পেস্ট ও শকুন্তলার মধ্যে রবীন্দ্রসৃষ্ট প্রবন্ধে বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য প্রসঙ্গ

শেক্সপীয়ের 'টেম্পেস্ট' নাটকের সঙ্গে কালিদাসের নাটক শকুন্তলার তুলনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-ওই দুই নাটকের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য এবং কিছু অনৈক্যের কথা বলেছেন। সাদৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বাহ্য সাদৃশ্যের কথাই বেশি করে বলেছেন। টেম্পেস্টের নায়িকা একটি দ্বীপে পিতার স্নেহাশ্রয়ে লালিতপালিত, সেই দ্বীপের নির্জনতায় তার চরিত্রের বিকাশ ; শকুন্তলাও লোকালয় বর্জিত অরণ্যের মধ্যে এক তপোবনে লালিত। সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের সঙ্গে অরণ্যমধ্যের আশ্রমের সাদৃশ্য আছে। মিরান্দা দ্বীপের নির্জনতায় মানুষ, আশ্রমে শকুন্তলা তার দুই সখী অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদার সাহচর্য বড়ো হয়ে

উঠেছে, কিন্তু অরণ্যপ্রকৃতির প্রভাব মিরান্দা এবং শকুন্তলা কেউই এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাছাড়া দুষ্যন্ত আশ্রমে এসে শকুন্তলার প্রতি মুগ্ধ হয়; বলা বাহুল্য, শকুন্তলাও রাজার প্রতি আসক্ত হয়। অনুরুপভাবে না হলেও ঘটনাচক্রে ফার্দিনান্দ দ্বীপে আসার পর মিরান্দার প্রতি তারও আসক্তি জন্মায় এবং মিরান্দাও ফার্দিনান্দকে ভালোবাসে । সাদৃশ্য এইটুকু।

কিন্তু বৈসাদৃশ্য অনেক বেশি। টেম্পেস্টে এবং শকুন্তলা নাটকের বক্তব্য শুধু দুটি নরনারীর মিলনের কথাই নয়, বিশেষ করে শকুন্তলার ত' নয়ই। শকুন্তলার মধ্যে মিলনের কথাই শুধু ব্যক্ত হয়নি। টেম্পেস্ট নাটকে মিরান্দা এবং ফার্দিনান্দের মিলনই মুখ্য ঘটনা, শকুন্তলায় দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলনের মাধ্যমে লেখক শ্রেয়োবোধের একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির কথা আছে। সে পরিণতি ফুল থেকে ফলে, মর্ত্য থেকে স্বর্গে, স্বভাব থেকে ধর্মে পরিণতি ।

শকুন্তলার পতন প্রথম অঙ্কেই দেখা গেছে। যৌবনমত্ততার লীলাচাঞ্চল্য, পরম লজ্জার সঙ্গে আত্মপ্রকাশের ভাব সবই প্রথম অঙ্কে ব্যক্ত; শকুন্তলা যে কত সরল এবং পবিত্র - তাও এই অঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে দুষ্যন্তের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে শেখেনি, তপোবনে হরিণী যেমন ব্যাধকে জানতে পারে না, সর্বদা নিঃশঙ্ক থাকে, শকুন্তলাও তেমনি অসতর্ক থেকে গেছে।

শকুন্তলা আশ্রমেরই অঙ্গীভূত, আশ্রমের গাছপালা বা প্রাণীর মতোই সে তপোবনের অংশবিশেষ। তপোবনের গাছপালায় জলসেচন করার সময় শকুন্তলা নিজেকে তাদের আত্মীয় ভেবেছে, বন জ্যোৎস্নাকে সে নিজের অন্তরে গ্রহণ করেছে। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করছে, তখন বোঝা যায় - তার সঙ্গে বন প্রকৃতির নিবিড় নৈকট্য কতখানি গভীর ও আন্তরিক।

টেম্পেস্টে এ ভাব নেই। মিরান্দার হৃদয়ে কারুণ্য আছে, দ্বীপের প্রকৃতির সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেনি। ঝড়ে ভগ্নতরী-হতভাগ্যদের প্রতি করুণায় সে ব্যথিত বোধ করেছে।

তার বাবা ফার্দিনান্দকে যখন অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছেন, তখনও মিরান্দার কারুণ্য জেগেছে।

মিরান্দার সঙ্গে শকুন্তলার পার্থক্য আরও আছে। মিরান্দাকে দ্বীপ প্রকৃতি থেকে তুলে নিলে তার হৃদয়ে টান পড়বে না; কিন্তু শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত, সে তপোবন-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিকভাবে জড়িত। আর একটি বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করতে হবে। শকুন্তলা আশ্রমে সমবয়সী সখীদ্বয়ের সাহচর্যে, আশ্রমের জীবনাচর্যে লালিতপালিত; মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্য বড়ো হয়ে উঠেছে, তার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি । শকুন্তলা সমানবয়সী সখীদের সঙ্গে কথাবার্তায়, হাসিঠাট্টায়, ভাবের আদান-প্রদানে মানুষ । ফলে উভয়ের চরিত্রের সরলতা একদেশী নয়, শকুন্তলার সারল্য স্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত। শকুন্তলার যৌবনাগমকে সখীরা সতর্ক করেছে, তাই শকুন্তলা লজ্জা করতে শিখেছে। মিরান্দার ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি।

শকুন্তলা সরল বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখেছে, চরম বিশ্বাসঘাতকতার মুহূর্তেও সে নিজেকে স্থির রাখতে পেরেছে। মিরান্দার কিন্তু এরকম পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হয়নি, সংসারজ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো সংঘাত ঘটেনি । তাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্যই বেশি।

শকুন্তলাকে প্রকৃতির অংশ করে অঙ্কিত করা হয়েছে, তপোবন ত্যাগ করে পৃতিগৃহে যাত্রাকালে প্রকৃতি বিধুর হয়ে ওঠে, বেদনা বোধ করে। মিরান্দা দ্বীপপ্রকৃতির সঙ্গে তেমন একান্ত হতে পারে নি, সেখানকার সমুদ্র-পর্বতের সঙ্গে তার কোনো ভাবাত্মক যোগ হয় নি। টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতির রূপক হিসেবে যদিও এরিয়েলের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তবু মানুষের সঙ্গে সেই প্রকৃতির কোনো যোগসাধন ঘটেনি। দ্বীপ থেকে চলে যাবার সময় মিরান্দা বা প্রস্পেরোর কোনো বিদায় সম্ভাষণ হয় নি এরিয়েলের সঙ্গে। টেম্পেস্টে শুধু পীড়, শাসন, দমন আর শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি এবং সদ্ভাব।

আশ্রমমৃগের মতোই শকুন্তলা তপোবনের অংশীভূত। লতার সঙ্গে ফুলের যে সম্পর্ক, এই বনপ্রকৃতি ও তপোবনের সঙ্গে শকুন্তলার সেই রকম স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

টেম্পেস্ট নাটকে প্রকৃতি এমনভাবে মানুষের আত্মীয় হয়ে ওঠেনি। মানুষ সেখানে প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করতে চেয়েছে। টেম্পেস্ট নাটকের নামটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে এখানে মানুষে-প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে-মানুষে বিরোধ । মানুষ শক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে দমন করতে চাইছে; শকুন্তলায় এই শক্তির বা দম্ভের প্রাবল্য দেখানো হয় প্রবৃত্তির কথাও বেশি বলা হয়নি, আভাসে ইঙ্গিতে প্রবৃত্তির কথা বলার পরই শ্রেয়োবোধের পথের ইঙ্গিত দেখানো হয়েছে। রাজসভায় পতিদ্বারা প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলার কোনো অভিযোগ নেই, সে ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা কল্যাণবোধের দ্বারা শ্রেয়োলাভে ব্রতী হয়েছে। মিরান্দাকে প্রেমের ক্ষেত্রে এমন পরীক্ষা দিতে হয় নি, ফাদিনান্দ মিরান্দাকে কতদূর ভালোবাসে তা পরখ করার জন্যে প্রস্পেরো যখন ফার্দিনান্দের কৃচ্ছসাধন করাচ্ছিলেন, তখন ফার্দিনান্দের জন্যে মিরান্দার বোধ ছিল এই মাত্র।

টেম্পেস্টে শক্তির লীলা দেখা যায়, শকুন্তলায় আছে কল্যাণের প্রশান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। তাই মিরান্দা সরল মাধূর্যে গঠিত হয়েও সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ রয়ে গেছে, পক্ষান্তরে শকুন্তলার সরলতা অপরাধে দুঃখে অভিজ্ঞতায় স্থায়িত্বলাভ করেছে। শকুন্তলায় আরম্ভ আছে, পরিণতিও; টেম্পেস্টে আরম্ভের যে সুর, পরিণতিও সেই দিকে। প্রেম থেকে শ্রেয়ে উত্তরণ শুধু শকুন্তলার চরিত্রেই দেখা যায়। এইখানেই এই দুই নায়িকা চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য।

১২.৫। শকুন্তলা প্রবন্ধে স্বর্গচ্যুতি থেকে স্বর্গপ্রাপ্তির বর্ণনা

Paradise Lost এবং Paradise Regained ইংলন্ডের কবি জন মিল্টনের লেখা দুখানি মহাকাব্য। এদের প্রথম কাব্যটিতে সর্পরূপী শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অপরাধে আদি মানব-মানবী আদম এবং ঈভের স্বর্গচ্যুতির কথা আছে, আর দ্বিতীয়টিতে মহাত্মা যীশুর পুণ্য প্রভাবে এবং তাঁর অমর আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে মানবজাতি কীভাবে আবার স্বর্গরাজ্য পেল- সেই কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকে ওই দুটি কাব্যের- স্বর্গচ্যুতি ও স্বর্গপ্রাপ্তির সমাবেশ ঘটেছে। অবশ্য স্বর্গ বলতে এখানে প্রেমের স্বর্গকেই বুঝতে হবে।

শকুন্তলা নাটকের প্রথমেই আমরা দেখি যে তাপসকন্যা শকুন্তলা পবিত্র হৃদয়ে তপোবনে নিসর্গ প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে একাত্ম হয়ে আছে। সেই তপোবনে শিকারী রাজা দুষ্যন্ত এসে পড়ায় তপোবনের নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকে কামনার পাপ প্রবিষ্ট হল। রাজার আবির্ভবে শকুন্তলার হৃদয়ে চাঞ্চল্য জাগলো। স্বর্গ সদৃশ তপোবন এবং সেখানকার প্রকৃতিলোক থেকে শকুন্তলা বিচ্যুত হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় শকুন্তলাকে বনাশ্রম ছেড়ে যেতে হল রাজার আশ্রয়ে । দুষ্যন্তের পাপলব্ধ কপট প্রেমের কলুষে শকুন্তলার পবিত্রতার স্বর্গ নষ্ট হয়ে গেল; শকুন্তলা তপোবনের স্বর্গলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়লো। একে বলা হয়েছে Paradise Lost।

এর পরই শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা, রাজপুরীতে দুষ্যন্তর দ্বারা প্রত্যাখ্যান, এবং আত্মগ্লানি ও অপমানের মধ্যে রাজভবন ত্যাগ । স্বামীর এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান শকুন্তলাকে দুঃখের সাধনায় ব্রতী করেছে। আর অন্যদিকে শকুন্তলাকে ত্যাগ করার পর ঘটনাচক্রে দুষ্যন্তের পূর্বকথা স্মরণে উদিত হয়। ফলে রাজা অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে লাগলেন। এই আগুনে তাঁর চরিত্র সংশোধিত হল।

অবশেষে তপস্বিনী জ্যোতির্ময়ী শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের মিলন ঘটলো। বাসনাজাত প্রেম থেকে শকুন্তলা মুক্ত, তপস্যায় সে এখন পরিশুদ্ধ । মারীচের আশ্রমে হঠাৎ একদিন দুষ্যন্তর সঙ্গে দেখা। অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে দুষ্যন্তও এখন শুচি। তিনি শকুন্তলাকে আপনা থেকে বরণ করে নিলেন। জৈবিক তাড়নার পাপে প্রণয়-প্রণয়ী সৌন্দর্যের তথা প্রেমের স্বর্গ হারিয়েছিল, আবার দুঃখ ও অনুশোচনার সাধনার মধ্যে দিয়ে তারা এক নতুন স্বর্গে এসে পৌঁছল । একে বলা হয়েছে Paradise Regained.

এখানে স্বর্গ হল প্রেমের স্বর্গ । দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেম জীবনের দুটি অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে। কীভাবে এই স্বর্গ লুপ্ত হল, আবার কী ভাবেই বা তার পুনরুদ্ধার ঘটলো- রবীন্দ্রনাথ অল্প কথায় সুন্দরভাবে তা ব্যক্ত করেছেন, এবং প্রেমের উন্মত্ততা এবং প্রশান্তি দেখিয়ে এই মন্তব্য করেছেন যে "শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে"।

১২.৬। রাজসিংহ: মূল প্রবন্ধ পাঠ

রাজসিংহ প্রথম হইতে উলটাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে, এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিতেছে। এই অনিবার্য অগ্রসরগতি সঞ্চার করিবার জন্য বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জন করিয়াছেন, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র। কোনো ভীরু লেখকের হাতে পড়িলে ইহার মধ্যে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বড়ো বড়ো কৈফিয়ত বসিত। জবাবদিহির ভয়ে তাহাকে অনেক কথা বাড়াইয়া লিখিতে হইত। সম্রাটের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাদশাহজাদীর সহিত মোবারকের প্রণয়ব্যাপার, তাহা লইয়া দুঃসাহসিকা আতরওয়ালী দরিয়ার প্রগল্‌ভতা, চঞ্চলকুমারীর নিকট আপন পরামর্শ ও পাঞ্জা-সমেত যোধপুরী বেগমের দূতীপ্রেরণ, সেনাপতির নিকট নৃত্যকৌশল দেখাইয়া দরিয়ার পুরুষবেশী অশ্বারোহী সৈনিক সাজিবার সম্মতি গ্রহণ–এ-সমস্ত যে একেবারেই সম্ভবাতীত তাহা না হইতে পারে–কিন্তু ইহাদের সত্যতার বিশিষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু এক-একটি ছোটো ছোটো পরিচ্ছেদে ইহাদিগকে এমন অবলীলাক্রমে অসংকোচে ব্যক্ত করিয়া গেছেন যে, কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করিতে সাহস করে না। ভীতু লেখকের কলম এই-সকল জায়গায় ইতস্তত করিত, অনেক কথা বলিত এবং অনেক কথা বলিতে গিয়াই পাঠকের সন্দেহ আরো বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত।

বঙ্কিমবাবু একে তো কোথাও কোনোরূপ জবাবদিহি করেন নাই, তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে নির্দোষ পাঠকদিগকেও ধমক দিতে ছাড়েন নাই। মানিকলাল যখন পথের মধ্যে হঠাৎ অপরিচিতা নির্মলকুমারীকে তাহার সহিত এক ঘোড়ায় উঠিয়া বসিতে বলিল এবং নির্মল যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে মানিকলালের অনুরোধ রক্ষা করিল, তখন লেখক কোথায় তাঁহার স্বরচিত পাত্রগুলির এইরূপ অপূর্ব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইবেন, তাহা না হইয়া উলটিয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন–

‘বোধ হয় কোর্টশিপটা পাঠকের বড়ো ভালো লাগিল না। আমি কী করিব। ভালোবাসাবাসির কথা একটাও নাই–বহকালসঞ্চিতপ্রণয়ের কথা কিছু নাই –‘হে প্রাণ! ‘হে প্রাণাধিকা! ’ সে-সব কিছুই নাই–ধিক!’

এই গ্রন্থবর্ণিত পাত্রগণের চরিত্রের, বিশেষত স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বড়ো একটা দ্রুততা আছে। তাহারা বড়ো বড়ো সাহসের এবং নৈপুণ্যের কাজ করে অথচ তৎপূর্বে যথেষ্ট ইতস্তত অথবা চিন্তা করে না। সুন্দরী বিদ্যুৎরেখার মতো এক নিমেষে মেঘাবরোধ ছিন্ন করিয়া লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে, কোনো প্রস্তরভিত্তি সেই প্রলয়গতিকে বাধা দিতে পারে না। স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ করে; তাহার সমগ্র মনপ্রাণ লইয়া বিবেচনা চিন্তা বিসর্জন দিয়া একেবারে অব্যবহিতভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার প্রাত্যহিক গৃহকর্মসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্যবেগে আকর্ষণ করিয়া আনে, পাঠককে পূর্ব হইতে তাহার একটা পরিচয় একটু সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু তাহা পুরাপুরি দেন নাই।

সেইজন্য ‘রাজসিংহ’ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঙ্কা সংশয়-ভারে ভারাক্রান্ত, কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়–কিন্তু ‘রাজসিংহ’-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই। যাহারা আজকালকার ইংরাজি নভেল বেশি পড়ে তাহাদের কাছে এই লঘুতা বড়ো বিস্ময়জনক। আধুনিক ইংরাজি নভেলে পদে পদে বিশ্লেষণ–একটা সামান্যতম কার্যের সহিত তাহার দূরতম কারণপরম্পরা গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়–ব্যাপারটা হয়তো ছোটো কিন্তু তাহার নথিটা বড়ো বিপর্যয়। আজকালকার নভেলিস্টরা কিছুই বাদ দিতে চান না, তাঁহাদের কাছে সকলই গুরুতর। এইজন্য উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ংকর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে।

এইজন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভয় হয়। মনে হয়, কর্মক্লান্ত মানবহৃদয়ের পক্ষে বাস্তবজগতের চিন্তাভার অনেক সময় যথেষ্টের বেশি হইয়া পড়ে, আবার যদি সাহিত্যও নির্দয় হয় তবে আর পলায়নের পথ থাকে না। সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না।

কিন্তু সত্যকে সম্যক প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালোরূপ অনুভবগম্য হইয়া হৃদয়ের আনন্দ উৎপাদন করে; কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।

বঙ্কিমবাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিগ্ধরূপে সম্ভবপর ও প্রশ্নসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলাভঙ্গিতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হয় নাই। যেন রেলপথের মাঝে মাঝে এমন এক-আধটা ব্রিজ আছে যাহা পুরা মজবুত বলিয়া বোধ হয় না–কিন্তু চালক তাহার উপর দিয়া এমন দ্রুত গাড়ি লইয়া চলে যে, ব্রিজ ভাঙিয়া পড়িবার অবসর পায় না।

এমন হইবার কারণও স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যখন বৃহৎ সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে চলে তখন তাহারা সমস্ত ঘরকর্‌না কাঁধে করিয়া লইয়া চলিতে পারে না। বিস্তর আবশ্যক দ্রব্যের মায়াও তাহাদিগতে ত্যাগ করিতে হয়। চলৎশক্তির বাধা তাহাদের পক্ষে মারাত্মক। গৃহস্থ-মানুষের পক্ষে উপকরণের প্রাচুর্য এবং ভারবাহুল্য শোভা পায়।

রাজসিংহের গল্পটা সৈন্যদলের চলার মতো–ঘটনাগুলা বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রাজসিংহের সহিত চঞ্চলকুমারীর প্রণয়ব্যাপরটা তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই বলিয়া কোনো কোনো পাঠক এবং সম্ভবত বহুসংখ্যক পাঠিকা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিমবাবু বড়ো-একটি দুর্লভ অবসর পাইয়াছিলেন –এই সুযোগে

কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং করুণরসের বরুণবাণে দিগ্ভবিদিক সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সংকীর্ণ সন্ধিপথে বজ্রস্তনিতরবে ফেনাইয়া চলিতেছে–তাহারই উপর দিয়া সামাল্ সামাল্ তরী। তখন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্রেমাভিনয় করিবার সময় নহে।

তখনকার যে প্রেম, সে অত্যন্ত বাহুল্যবর্জিত সংক্ষিপ্ত সংহত। সে তো বাসররাত্রের সুখশয্যার বাসন্তী প্রেম নহে–ঘনবর্ষার কালরাত্রে মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে–মান-অভিমান লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়া ত্রস্ত নায়িকা চকিত বাহুপাশে নায়ককে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুদীর্ঘ সুমধুর ভূমিকার সময় নাই।

এই অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং আপনার অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর আলিঙ্গন অনুভব করিতেছে। কোথায় ছিল ক্ষুদ্র রূপনগরের অন্তঃপুরপ্রান্তে একটি বালিকা, কালক্রমে সে কোন্ ক্ষুদ্র রাজপুত নৃপতির শত রাজ্ঞীর মধ্যে অন্যতম হইয়া অসম্ভব-চিত্রিত লতার উপরে অসম্ভব-চিত্রিত পক্ষী-খচিত শ্বেতপ্রস্তররচিত কক্ষপ্রাচীরমধ্যে পুরু গালিচায় বসিয়া রঙ্গসঙ্গিনীগণের হাসিটিটকারি-পরিবৃত হইয়া আলবোলায় তামাকু টানিত, সেই পুষ্পপ্রতিমা সুকুমার সুন্দর বালিকাটুকুর মধ্যে কী এক দুর্বার দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিল –সে আজ বাঁধমুক্ত বন্যার একটি গর্বোদ্ধত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল-রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত রঙমহলে সুন্দরী জেবউন্নিসা–সে সুখের উপর সুখ, বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অত্মরাত্মাকে আরামের পুষ্পরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন্ করিয়া রাখিয়াছিল–সেদিনের সেই মৃত্যুদোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন্ মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহুবেষ্টনে পীড়ন করিয়া ধরিল, সম্রাটদুহিতাকে কে সেই সর্বত্রগামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিল যে দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটিরবাসিনী কৃষককন্যার সহিত এক বেদনাশয্যায় শয়ন করাইয়া দেয়! দস্যু মানিকলাল হইল বীর, রূপমুগ্ধ মোবারক মৃত্যুসাগরে আত্মবিসর্জন করিল, গৃহপিঞ্জরের নির্মলকুমারী বিপ্লবের বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল এবং নৃত্যকুশলা

পতঙ্গচপলা দরিয়া সহস্য অট্টহাস্যে মুক্তকেশে কালনৃত্যে আসিয়া যোগ দিল। অর্ধরাত্রির এই বিশ্বব্যাপী ভয়ংকর জাগরণের মধ্যে কি মধ্যাহ্নকুলায়বাসী প্রণয়ের করুণ কপোতকূজন প্রত্যাশা করা যায়?

'রাজসিংহ' দ্বিতীয় 'বিষবৃক্ষ' হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। 'বিষবৃক্ষে'র সুতীব্র সুখদুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল; অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। 'রাজসিংহে'র প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি মনের উপর সেরূপ রক্তবর্ণ সুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না। তাহার কারণ 'রাজসিংহ' স্বতন্ত্রজাতীয় উপন্যাস।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, 'রাজসিংহ' পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম-প্রথম খটকা লাগিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়োই বেশি বাড়াবাড়ি দেখিতেছি -কাহারও যেন মিষ্টমুখে দুটো ভদ্রতার কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া না গিয়া আর-একটু গভীরতররূপে কর্ষণ করিয়া গেলে ভালো হইত। যখন এই-সকল কথা ভাবিতেছিলাম তখন 'রাজসিংহে'র ভিতরে গিয়া প্রবেশ করি নাই।

পর্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মতো ছুটিতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে, মনে হয় না তাহারা কোনো কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছুদূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে-ক্রমেই গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্বত ভাঙিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে– সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

'রাজসিংহে'ও তাই। তাহার এক-একটি খণ্ড এক-একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম-প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি –তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি ধ্বনি গভীর স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ

ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক-বা নদীর স্রোত, কতক-বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক-বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক-বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক-বা কালপুরুষলিখিত ইতিহাসের অব্যাকুল বিরাট বিস্তার, কতক-বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ–উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িক জেবউন্নিসা।

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী, মানিকলাল প্রভৃতি ছোটোবড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদুর্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত-ইতিহাসের রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত। তাহাদের জীবন-ইতিহাসের, তাহাদের সুখদুঃখের স্বতন্ত্র মূল্য নাই–অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই। জেবউন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অংশীভূত করিয়া লয় নাই, সে আপনার জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখো, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হ.ইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্মান্তিক আর্তধ্বনিও, রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয়তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ জাতীয়-ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।

মোগল-সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে সম্রাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া, প্রজার সুখদুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার জাগরণের দিন উপস্থিত হইল।

বিলাসিনী জেবউন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাটদুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্মের মস্তকে আপন জরিজহরতজড়িত পাদুকাখচিত সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার মর্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখমন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল–তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল–দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না, কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেবউন্নিসা সম্রাটপ্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধুলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত জগৎবাসিনী রমণী।

ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড়ো-একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্যোগের রাত্রে এক দিকে মোগলের অভ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর-এক দিকে সর্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে; সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবে –কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাসপর্যায়কে নীরবে নিয়মিত করিতেছেন তিনি এই ধূলিলুণ্ঠ্যমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে–কেহ কাহারো অগ্রবর্তী না হয়, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি-একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশি করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোনো কোনো অতিকৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তরভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, এবং সেইজন্য মনঃক্ষোভে লেখককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্তব্য, লেখক গ্রন্থবিশেষে কী করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন। পূর্ব হইতে একটা অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসংগত নহে। গ্রন্থপাঠারম্ভে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ কথাটা বলিতে হইল।

১২.৭। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের মত

বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হল ‘রাজসিংহ’ (১৮৮২)। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন- “আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিনাই। ‘দুর্গেশনন্দিনী', ‘চন্দ্রশেখর' বা ‘সীতারাম'কে এতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।” প্রথম প্রকাশের সময় উপন্যাসটি চার খণ্ডে সম্পূর্ণ হলেও, চতুর্থ সংস্করণে উপন্যাসটি আট খণ্ডে সমাপ্ত হয়। সেগুলি হল- ‘চিত্রদলন’, ‘নন্দনে নরক’, ‘বিবাহে বিকল্প’, ‘রন্ধ্রেযুদ্ধ’,

'অগ্নির আয়োজন', 'অগ্নির উৎপাদন', 'অগ্নিজ্বলিল', 'আগুনে কে কে পুড়িল' । রুপনগরের রাজা বিক্রম সোলাঙ্কির মোঘলপদলেহন বৃত্তিতে রাজপুত্র কন্যা তরুণী চঞ্চলকুমারীর মনে চঞ্চলতা সৃষ্টি করে। আর তার ফলেই চঞ্চলকুমারীর ঔরঙ্গজেবের চিত্রদলন। রাজসিংহকে যে চঞ্চলকুমারী ভালোবাসতেন, তার প্রমাণ পাই চঞ্চকুমারীর রাজসিংহের ছবি লুকিয়ে রাখার মধ্যে, রাজপুত ও মোঘলদের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য লাভ করায় প্রথম খন্ডে চিত্রদলন ঘটনা প্রাধান্য লাভ করেছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এসেছে শাহজাদী জেবউন্নিসা। মোবারক দরিয়া এবং জেবউন্নিসার মাধ্যমে ঔরঙ্গজেবের নিকটে চিত্রদলনের সংবাদ পৌছানোর মাধ্যমে মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনির নায়িকা জেবউন্নিসার সংযোগ সাধন ঘটেছে। ঔরঙ্গজেব চঞ্চলকুমারীকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন রূপনগরের রাজার কাছে এবং এজন্য সেনা পাঠালেন। তৃতীয়খন্ডে চঞ্চলকুমারী নিজেকে রক্ষা করতে নায়ক রাজসিংহের কাছে বার্তা পাঠালেন। চতুর্থ খণ্ডে রাজসিংহ ও মানিকলালের প্রয়াসে মোঘল সেনাদের পরাজয় ঘটে, আর চঞ্চকুমারী ও রাজসিংহ উদয়পুরের যাত্রা করেন। চতুর্থ সংস্করণে আলোচ্য চারটি খণ্ডের সঙ্গে পরের চারটি খন্ড যুক্ত হয়। পঞ্চম ও যষ্ঠ খণ্ডে পরাজিত ঔরঙ্গজেব পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়েছেন। ঔরঙ্গজেব রাজসিংহকে দমন করতে চেয়েছেন এবং রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারীর বিবাহে বাধা সৃষ্টি করেছেন। সপ্তমখণ্ডে পর্বতের পথে ঔরঙ্গজেব ও বাদশাহ বাহিনীর সঙ্গে রাজপুত বাহিনীর যুদ্ধ হয়েছে এবং সেই যুদ্ধে বাদশাহ বাহিনী বন্দি হয়েছে। এখানে উদিপুরী ও জেবউন্নিসার সঙ্গে মোবারকের মিলন ঘটেছে। শেষ খণ্ডে রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধের পরিণতি এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছে। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরঙ্গজেব রাজসিংহ এবং বিধাতা পুরুষ। উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা। জেবউন্নিসা ঔরঙ্গজেবের কন্যা। জেবউন্নিসা ভোগবাসনাকে তৃপ্ত করাই জীবন বলে জেনেছিল। তার রুপের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল মোঘল সেনা মোবারক। জেবউন্নিসা ভোগের বাসনা মেটাতে মোবারককে চেয়েছে, তার বিবাহের প্রভাবে রাজি হয়নি। রাজসিংহ উপন্যাসের মূল

কাহিনির পাশে মানিকলাল-নির্মলকুমারীর ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে গল্পভাষ এবং মৌবারক-দরিয়া-জেবউন্নিসাকে নিয়ে উপকাহিনি গঠিত হয়েছে। মূল কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনি ও গল্পভাষগুলোর অদ্ভুত সমন্বয় সাধন ঘটিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র ।

১৩০০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় 'সাধনা' পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'রাজসিংহ' প্রবন্ধ। সেখানে তিনি বলেছেন-

(১) "প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি-তাহার পর যষ্ঠখণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর, এবং জলের বর্ণ ঘন কৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে। তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছাস, কতক বা ব্যক্তি বিশেষের মজ্জমাল তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য, অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

(২) জেবউন্নিসা চরিত্রের স্বরুপ পরিচয় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন- "জেবউন্নিসা সম্রাটপ্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন-আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্তজগৎ বাসিনী রমণী ।

ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিয়া-কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম-অংশে বড়ো একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্যোগের রাতে একদিকে মোগলের অগ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া-ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর-একদিকে সর্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া-ফাটিয়া উঠিতেছে। সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে? কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাস-পর্যায়কে নীরবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনি এই ধূলি লুণ্ঠ্যমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

১২.৮। অনুশীলনী

১। 'শকুন্তলা' প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

২। রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের প্রভাব আলোচনা করুন।

৩। টেম্পেস্ট ও শকুন্তলার মধ্যে রবীন্দ্রসৃষ্ট প্রবন্ধে বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে শকুন্তলার পূর্ব মিলন ও উত্তর মিলন প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে শকুন্তলার স্বর্গ চ্যুতি থেকে স্বর্গ প্রাপ্তির বর্ণনা দিন।

৬। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহ' প্রবন্ধে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করুন।

১২.৯। গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রদর্শন – ড. হিরন্ময় বন্দযোপাধ্যায়।

২। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: ধর্ম ও দর্শনচিন্তা – ড. সতেন্দ্রনাথ রায়।

৩। রবীন্দ্রচেতনায় মানবধর্ম – ড. তুষারকণা রায়।

৪। রবীন্দ্রকাব্যে নিসর্গ প্রকৃতি – ড. নন্দদুলাল বণিক।

৫। আত্মচরিতের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য – ড. নন্দদুলাল বণিক।

৬। কবীর ও রবীন্দ্রনাথ: চেতনার অন্তলোক - ড. নন্দদুলাল বণিক।

৭। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য রুপ- স্বরুপ – স্মরণ আচার্য।

একক: ১৩। রবীন্দ্র প্রবন্ধ: কালান্তর ও সভ্যতার সংকট

বিন্যাসক্রম

১৩.১। কালান্তর প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য

১৩.২। কালান্তর : মূল প্রবন্ধ পাঠ

১৩.৩। ভারতে য়ুরোপের অভিঘাত

১৩.৪। কালান্তর : নামকরণ প্রসঙ্গ

১৩.৫। কালান্তরের শিল্পকৌশল

১৩.৬। সভ্যতার সংকট : মূল প্রবন্ধ পাঠ

১৩.৭। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধের বিষয়বস্তু

১৩.৮। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবনা

১৩.৯। অনুশীলনী

১৩.১০। গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১। কালান্তর প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথের প্রবহমানকালের চেতনা তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'কালান্তরে'র মধ্যে সুগ্রথিত। 'কালান্তরে'র প্রবন্ধ গুলির মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ তথা ঔপনিবেশিকতাবাদের কথা মননশীল আলোচনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, শিল্প ব্যবস্থা বা গান্ধীজীর চরকার মধ্যে আবদ্ধ নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কবিকে করেছিল উতলা। রবীন্দ্রনাথ এই জীবনঘাতী যুদ্ধ, মানবাত্মার অবমাননায় মর্মাহত। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে

সভ্যতার সংকটের ঘূর্ণাবর্ত কিভাবে মানব সভ্যতাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল তা প্রতিফলিত। তার সঙ্গে বিশ্বের রাষ্ট্রনীতি ও দেশের রাষ্ট্রনীতির মননশীল চিন্তা ও ভবিষ্যৎদ্বাণী ও তিনি শুনিয়েছেন। এই প্রবন্ধ পাঠের ফলে আমরা কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অভিহিত হতে পারি। যেমন- বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশ্ব যন্ত্রণার প্রতিছবি, শুধু পাশ্চাত্য নয় তার কুলপ্লাবী জীবনস্রোত প্রাচ্য দেশে এনেছিল নবজাগরণ। এই নবজাগরণের ফল স্বরূপ দেশে দেশে মানবতাবাদকে দেওয়া হল প্রাধান্য। মানুষের উপরে বিশ্বাস হারানো পাপ- এই ধরনের অভয় বাদী আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। 'কালান্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থটি ও সমকালে নয় ভবিষ্যতের পথ নির্দেশক সাহিত্যের দিক থেকে এর চিরকালীন মাত্রা লাভ করে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৩.২। কালান্তর: মূল প্রবন্ধ পাঠ

কালান্তর একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পড়াপড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বদ্ধ। পরস্পরকে নিয়ে রাগদ্বেষে গল্পে-গুজবে তাসে-পাশায় এবং তার সঙ্গে ঘণ্টা-তিনচার পরিমাণে দিবানিদ্রা মিশিয়ে দিনটা যেত কেটে। তার বাইরে মাঝে মাঝে চিত্তানুশীলনার যে-আয়োজন হত সে ছিল যাত্রা সংকীর্তন কথকতা রামায়ণপাঠ পাঁচালি কবিগান নিয়ে। তার বিষয়বস্তু ছিল পুরাকাহিনীভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত। যে-জগতের মধ্যে বাস সেটা সংকীর্ণ এবং অতি-পরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বার বার হয়েছে আবর্তিত অপরিবর্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবন-যাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে, সেই-সকল কঠিন সংস্কারের ইঁটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। এই সংসারের বাইরে মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্ দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেছে, তার ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতনপ্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর হয়ে ওঠে নি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ঘাতসংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পরের সীমানার সংকোচন-প্রসারণে পরিবর্তিত হচ্ছে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না। বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে-

মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্যসংঘটন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এইজন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল– কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের। রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয় নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্রসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল ফার্সি, তবু বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই ফার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়ে নি– একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে মার্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে ফার্সি-পড়া স্মিতপরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়। তখনকার বাংলা সাহিত্যের প্রধানত দুই ভাগ ছিল, এক মঙ্গলকাব্য আর-এক বৈষ্ণব পদাবলী। মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিম্বা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখি নে, বৈষ্ণব গীতিকাব্যে তো কথাই নেই। অথচ বাংলা ভাষায় ফার্সি শব্দ জমেছে বিস্তর, তা ছাড়া সেদিন অন্তত শহরে রাজধানীতে পারসিক আদবকায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয় কিন্তু তা সামান্য। বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলে নি। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বদ্ধ করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা-ভাঙাভাঙি চলেছিল কিন্তু এমন কিছু ঘটে নি যাতে বাহিরের বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হতে পারে। সেইজন্য পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।

তার পরে এল ইংরেজ কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে– তারা

সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়াছে যোগ-বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল না কষে ভাগেরই অঙ্কফল কষছে। দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর, তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাতালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সব-চেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।

ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে– কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারে নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির ‘পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে। এই চেষ্টা যে-ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম। আমরা য়ুরোপের কার কাছ থেকে কী কতটুকু পেয়েছি তাই অতি সূক্ষ্ম বিচারে চুনে চুনে অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার করে আজকাল কোনো কোনো সমালোচক আধুনিক লেখকের প্রতি কলম উদ্যত করে নিপুণ ভঙ্গীতে খোঁটা দিয়ে থাকেন। একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়, না হলেই সেই দৈন্যকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না– এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে চিত্ত জেগে আছে।

বর্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত, দেখা যাক তার স্বরূপটা কী। একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে, শুধু তাই নয় সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে সেখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে। সত্যসন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাতপ্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ

অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় তার প্রলোভনকেও সে নির্মমভাবে দমন করেছে। নিজের সহজ ইচ্ছার সঙ্গে সংগত করে সত্যকে সে যাচাই করে নি। প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।

যদিও আমাদের চারিদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ, মানুষের বুদ্ধির এমন একটা সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে, যা অহৈতুক আগ্রহে নিকটতম দূরতম অণুতম বৃহত্তম প্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান সমস্তকেই অধিকার করতে চায়; এইটে দেখিয়েছে যে, জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবি করতে পারে না।

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে-আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা-অপরাধের পংক্তি একই, তার শাসনও সমান– কোনো মুনিঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ সৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না।

সমাজে উচিত-অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাটখারাযোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না, এ-কথাটা এখনো আমরা সর্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেছি তা নয়, তবু আমাদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেছে সন্দেহ নেই। সমাজ যাদের অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেছে তাদেরও আজ দেবালয়প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এই আলোচনাটা তার প্রমাণ। যদিও একদল লোক নিত্যধর্মনীতির উপর ভর না দিয়ে এর অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থন আওড়াচ্ছেন, তবু সেই আপ্তবাক্যের ওকালতিটাই সম্পূর্ণ জোর পাচ্ছে না। আসল এই কথাটাই দেশের সাধারণের

মনে বাজছে যে, যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত, শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না, শংকরাচার্য-উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।

মুসলমান-আমলের বাংলাসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে, অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন শাসন পাকা করে তুলত, তেমনি করে অন্যায়ের বিভীষিকায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেছি। সেই নিষ্ঠুর বলের হারজিতেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতা-অশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ হত। ধর্মের নিয়ম মেনে চলবে সাধারণ মানুষ সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করবার দুর্দাম অধিকার অসাধারণের। সন্ধিপত্রের শর্ত অনুসারে আপনাকে সংযত করা আবশ্যক সত্যরক্ষা ও লোকস্থিতির খাতিরে, কিন্তু প্রতাপের অভিমান তাকে স্ক্রৎাপ্ অফ্ পেপারের মতো ছিন্ন করবার স্পর্ধা রাখে। নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্মসাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে একদিন ঈশ্বরত্বের লক্ষণ বলে মানুষ স্বীকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা', এই কথাটার অর্থ এই যে জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়, সেই পন্থায় দিল্লীশ্বরও জগদীশ্বরের তুল্য খ্যাতির অধিকারী। তখন ব্রাহ্মণকে বলেছে ভূদেব, তার দেবত্বে মহত্ত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব নেই, আছে অকারণ শ্রেষ্ঠতার নিরর্থক দাবি। এই অকারণ শ্রেষ্ঠতা ন্যায়-অন্যায়ের উপরে, তার প্রমাণ দেখি স্মৃতিশাস্ত্রে, শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে। ইংরেজসাম্রাজ্য মোগলসাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল ও ব্যাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কথা কোনো মূঢ়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না যে, উইলিঙডনো বা জগদীশ্বরো বা। তার কারণ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্মম শক্তির দ্বারা ঈশ্বরত্বের আদর্শের তুল্যতা আজ কেউ পরিমাপ করে না। আজ আমরা মরতে মরতেও ইংরেজ-শাসনের বিচার করতে পারি ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শে, এ-কথা মনে করি নে, কোনো দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা অশক্তের পক্ষে স্পর্ধা। বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা স্বীকার করে এক জায়গায় ইংরেজরাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমানভূমিতেই দাঁড় করিয়েছে।

যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য, তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্মপরিবর্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহুলোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে; এ-কথা ভুলে যায় যে ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবলশক্তি। য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর-একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে যে-কোনো চেষ্টা করছি, সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা কোনোদিন মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারি নি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে-তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে,"A man is a man for a that"।

আজ আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। বর্তমান যুগে– অর্থাৎ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠোরোশো খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি। এইটিকে ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুবকেরা হাসাহাসি করে থাকে। য়ুরোপের যে-অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, সেই ইংলণ্ড তখন ঐশ্বর্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্তকালে কোনো ছিদ্র দিয়ে তার অন্নভাণ্ডারে যে

অলক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে, এ-কথা কেউ সেদিন মনেও করে নি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হঠতে পারে, বাতাস বইতে পারে উলটো দিকে, তার কোনো আশঙ্কা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না। রিফর্মেশন যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন যুগে য়ুরোপ যে-মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ন হয় নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাট্‌সিনি-গারিবালডির বাণীতে কীর্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্লাডস্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-একদিকে ইংরেজচরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসনকর্তৃত্বে ইংরেজের শরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল, সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম। কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেছি। মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়। অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবি, শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারে নি। তা হোক আচরণে পদে পদে প্রতিবাদসত্ত্বেও য়ুরোপের প্রভাব অল্পে অল্পে আমাদের মনে কাজ করছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়ে নি। তবু য়ুরোপের বিদ্যা প্রতিবাদের মধ্য দিয়েও আমাদের মনের মধ্যে সম্মান পাচ্ছে।

তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বেই বলেছি য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল,

দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সংগত অধিকারকে। এতে করেই সকল প্রকার অভাবত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েছে। এই আত্মসম্মানের গৌরববোধেই আজ পর্যন্ত আমরা স্বজাতি-সম্বন্ধে দুঃসাধ্যসাধনের আশা করছি, এবং প্রবল পক্ষকে বিচার করতে সাহস করছি সেই প্রবল পক্ষেরই বিচারের আদর্শ নিয়ে। বলতেই হবে এই চিত্তগত চরিত্রগত সহযোগ ছিল না আমাদের পূর্বতন রাজদরবারে। তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেই মূলগত দূরত্ব ছিল যাতে করে আমরা আকস্মিক শুভাদৃষ্টক্রমে শক্তিশালীর কাছে কদাচিৎ অনুগ্রহ পেতেও পারতুম, কিন্তু সে তারই নিজ গুণে, বলতে পারতুম না যে সর্বজনীন ন্যায়ধর্ম অনুসারেই, মানুষ ব'লেই মানুষের কাছে আনুকূল্যের দাবি আছে।

ইতিমধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চলল। বহুকালের সুপ্ত এশিয়ায় দেখা দিল জাগরণের উদ্যম। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বজাতি-সংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার। অর্থাৎ জাপান বর্তমান কালের মধ্যেই বর্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সে তা সম্যকরূপে প্রমাণ করল। দেখতে পেলেম প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেছে। অনেকদিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে, এবং এও মনে ছিল যে এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব ল এবং অর্ডর, বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর, দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন উৎপাদনের সুযোগ সাধন কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাই নে, কেন-না দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল ল এবং অর্ডরের প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠদানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।

আজ ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মনি আমেরিকার কাছে ঋণী। ঋণের অঙ্ক খুব মোটা। কিন্তু এর দ্বিগুণ মোটাও যদি হত, তবু সম্পূর্ণ শোধ করা অসাধ্য হত না, দেনদার দেশে যদি কেবলমাত্র ল এবং অর্ডর বজায় রেখে তাকে আর-সকল বিষয়ে বঞ্চিত রাখতে আপত্তি না থাকত। যদি তার অন্নসংস্থান রইত আধপেটা পরিমাণ, তার পানযোগ্য জলের বরাদ্দ হত সমস্ত দেশের তৃষ্ণার চেয়ে বহুগুণ স্বল্পতর, যদি দেশে শতকরা পাঁচ-সাত জন মানুষের মতো শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও চলত, যদি চিরস্থায়ী রোগে প্রজনানুক্রমে দেশের হাড়ে হাড়ে দুর্বলতা নিহিত করে দেওয়া সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টপ্রায় থাকত তার আরোগ্যবিধান। কিন্তু যেহেতু জীবনযাত্রার সভ্য আদর্শ বজায় রাখবার পক্ষে এ-সকল অভাব একেবারেই মারাত্মক, এইজন্যে পাওনাদারকে এমন কথা বলতে শুনলুম যে আমরা দেনাশোধ করব না। সভ্যতার দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষ কি এমন কথা বলতে পারে না যে, এই প্রাণ-দেউলে-করা তোমাদের দুর্মূল্য শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য দেনা আমরা বহন করতে পারব না যাতে বর্বরদশার জগদ্দল পাথর চিরদিনের মতো দেশের বুকের উপর চেপে থাকে। বর্তমান যুগে য়ুরোপ যে-সভ্যতার আদর্শকে উদ্ভাবিত করেছে য়ুরোপই কি স্বহস্তে তার দাবিকে ভূমণ্ডলের পশ্চিম সীমানাতেই আবদ্ধ করে রাখবে। সর্বজনের সর্বকালের কাছে সেই সভ্যতার মহৎ দায়িত্ব কি য়ুরোপের নেই।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয় নি– এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে "মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে। মধ্যযুগে অসভ্য তাতার বিজিত দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু করে তুলেছিল; তার বেদনা অনতিকাল পরে লুপ্ত হয়েছে। সভ্য য়ুরোপ চীনের মতো এত বড়ো দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে, তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জরিত হয়ে গেল। একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করবার জন্যে যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল, তখন সভ্য য়ুরোপ কী রকম করে

দুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল, সেই অমার্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্যের তদানীন্তন পরাহত আমেরিকান রাজস্বসচিব শুস্টারেরStrangling of Persiaবইখানা পড়লে। ওদিকে আফ্রিকার কন্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী-রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই-জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।

তার পরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন্ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে নি। তারা আসত কালো আঁধির মতো ধুলায় আপনাকে আবৃত করে, কিন্তু এ এসেছে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়স্রাব, অবরুদ্ধ পাপের বাধামুক্ত উৎস উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে, দগ্ধ করে দিয়ে দূরদুরান্তের পৃথিবীর শ্যামলতাকে। তার পর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার ‘পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা করে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে; একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে-য়ুরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একটা সংকোচ ছিল, আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সেই সংকোচকেই। আজকাল দেখছি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। সভ্য য়ুরোপের সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়র্লণ্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে-য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজ্‌মের নির্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের

একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবার কথা অল্পবয়সে আমরা য়ুরোপের বেদী থেকে শুনতে পেতুম, আজ সেখানে যারা খ্রিস্টের উপদেশকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, যারা শত্রুকেও হিংসা করা মনে করে অধর্ম, তাদের কী দশা ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

যুদ্ধবিরোধী ফরাসী যুবক রেনে রেইম লিখছেন:– So after the war I was sent to Guiana...Condemned to fifteen years penal servitude I have drained to the dregs the cup of bitterness, but the term of penal servitude being completed, there remains always the accessory punishment– banishment for life। One arrives in Guiana sound in health, young, vigorous, one leaves (if one leaves) weakly, old, ill॥॥One arrives in Guiana honest– a few months later one is corrupted...They (the transportees) are an easy prey to all the maladies of this land– fever, dysentery, tuberculosis and most terrible of all leprosy।

পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কীরকম দুঃসহ নরকবাস, সে-কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না। যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারিদিকে উদঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের ‘পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে– বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা। কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত

দিয়ে বলতে পারি "বিনিপাত", বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুদিনের মধ্যে দেখা দেয়, এই তো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারি নে, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, বলতে পারি নে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়। যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া-পর্যন্ত দেউলে হল। তার পরে আসুক কল্পান্ত।

১৩.৩। ভারতে য়ুরোপের অভিঘাত

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না তিনি সর্বকালের এক সেরা প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস, রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজনীতি, রাষ্ট্রীয় সাধনার সমস্যা নিয়ে সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বের প্রবন্ধাবলীতে। কালের যাত্রার রূপ ধরা পড়েছে তাঁর কালান্তরের প্রবন্ধসমূহে।

বৃটিশ ভারতে আমাদের জীবনগঠনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ। শুধু কি ব্রিটিশরা কলকারখানা এনেছে না পথঘাট তৈরী করেছে? ভারত চিত্তের আবরণ উন্মোচিত হয় নি কি? তাই "য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হতে থাকে।"পিছনের দিকে তাকিয়ে ১৩২১ সালে কবি যখন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী দেশপ্রেমিকের দেশসেবা সম্পর্কে লিখেছেন যে তার মধ্যে "দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটিই বড়ো ছিল" এবং ইউরোপের নকলে অনুপ্রাণিত দেশের মানুষের দেশহিতের অভিমানটিই বড়ো ছিল। জীবনের শেষদিকে কালান্তরের প্রবন্ধগুলিতে লিখেছেন- "প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর একদিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা।" ইংরেজ তার শক্তিরূপ আমাদের

দেখিয়েছে মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। মানুষে মানুষে যথার্থ সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়নি যাকে বলা চলে মানবসভ্যতা ও মনুষ্যত্ব। সৃজনশীল ইতিহাসের পথ বেয়ে চলেছে রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রবহমান ইতিহাসের বোধে তিনি জেগেছেন। তাই ভারতবর্ষের অনাচার, সামাজিক বোধ, প্রাচীন রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরার মনোভাব, সনাতন ধ্যানধারণার বিরুদ্ধ ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার।

১৩.৪। কালান্তর: নামকরণ প্রসঙ্গ

উনিশ শতক থেকে আরম্ভ করে বিশ শতাব্দী অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুহূর্ত পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ (১৩২০-১৩৪৮) অর্থাৎ সাতাশ বছরের দেশের ও বিশ্বের রাষ্ট্রনীতির স্বরূপ উপলবির ক্ষেত্রে বিশেষ বাধা সঙ্কটের কথায় রবীন্দ্রমনীষা ব্যস্ত। কবির ভাবনায় বিশ্ববীক্ষার মৌলিক ফলশ্রুতির অভাব অনুপস্থিত নয় অর্থাৎ তিনি কল্পান্তের যে নতুন দিগন্ত আছে তাঁর দিকে চেয়েছেন প্রসন্ন ইতিবাচক দৃষ্টিতে। সেই প্রত্যয় মানুষের প্রতি বিশ্বাস।

'কালান্তর' শব্দটিকে ভাঙলে অর্থ হয় অন্যকাল। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সভ্যতার ব্যভিচারিতায়, কৃতান্তরূপে সংকটরূঢ় মানবাত্মার কঠিন ও হিংসামত্ত প্রকাশকে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায়। নব পরিত্রাতা আসবেন। ভাবীকালের এই ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আশ্বস্ত ।

'কালান্তরে' আছে রবীন্দ্রনাথের ধীশক্তির মননশীল প্রকাশ বিশ্ব ইতিহাসে অনুস্মৃতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে কত বাস্তব ও দূরদর্শী ভাবনার রূপকার। প্রথম অনুচ্ছেদে মুসলমান আগমনের পূর্বকালের বাংলার ছবি ফুটেছে 'কালান্তর' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে। বাংলাদেশ ছিল এককালে 'ছায়াসুনিবিড় ও শান্তির নীড়' । নিশ্চিন্ত গ্রামের সীমায় কোন বহির্জগতেরই ছায়া পড়ে নি। জীবনযাত্রার এই অচল আলস্যের প্রথম আঘাত হানে মুসলমানরা কিন্তু মুসলমানরা আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গ তাই ভারতবর্ষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হলো না।

বাহুবল ছিল মুসলমানদের কিন্তু বাঙালি তথা ভারতবাসী চিত্র সম্পর্কে জানাতে পারেনি এই মুসলমান সম্প্রদায় ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অবসান মধ্যযুগের স্থির হয়ে রইল মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষে সাহিত্যের শাখা সমৃদ্ধি সেভাবে হয়নি হয়নি তা নয় কিন্তু বাংলা ভাষায় ভারতচন্দ্র ছাড়া অন্য কারুর ইতিহাসের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের পড়েনি যিনি দুর্লভ ফরাসি ভাষায় নিজের কাছে বাগবৈদগ্ধ্য বিস্তারে অসামান্য নিপুন ছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের সনাতনত্ব 'বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসেছে বাসা বেধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করেনি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসলো বন্ধ করে দিলেও বাইরের দিকের দরজা।'

ইতিহাসের দীর্ঘপথে মননিষ্ঠ পাদচারণার পরিচয় পাই - " ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল ঘুচে। ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্যের অধিকারী তাকে জীবনের ব্যবহারের পথ থেকে আলাদা করে দিল। নিরঙ্কুশ নিবৃত্তি মার্গের সাধক ছিলেন আমাদের মননশীল দেশবাসীরা "তার ফলে এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার আপোষ হইয়া গেছে; বিষয় বিভাগের মতো উভয়ের মহল বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেওয়াল উঠিল।" এবং এই দেওয়ালই ভারতের জঙ্গম প্রাণ শক্তিকে স্থাবর করে দিল। 'বৃহৎ মানববশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আর্ত হয়েছে - ইংরেজ জাতির ইতিহাসে।'

'য়ুরোপের চিত্তদূত' রূপে ইংরেজ পা রাখল ভারতবর্ষের মাটিতে। - 'ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার বাস্তবিকই ইংরেজের আগমন ও প্রশাসন ভারতবর্ষের বন্ধ্যা ভূমিতে নতুন জ্ঞান- বিজ্ঞানের জোয়ার আনল। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান য়ুরোপীয় শিক্ষাকে নতুন রূপ দিলেন 'First modern man in india Raja Rammohan Roy' এই যে রেনেসাঁস একান্তভাবেই আধুনিক-এর প্রত্যক্ষ নায়ক ইংরেজ আর উৎসভূমি য়ুরোপীয় সংস্কৃতি। এই রেনেসাঁসকে অনেকে মানতে পারেননি। রেনেসাঁস ইতালী থেকে প্রবাহিত হয়ে জার্মানী ও ইংল্যান্ডে ঘটিয়াছে সাহিত্যের নবোদয়। ভারতবর্ষের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম হয়নি- "সচল মনের প্রভাব, সজীব মন না নিয়ে

থাকতেই পারে না" এই দেওয়া নেওয়ার প্রবাহ সর্বদা চলছে। এতেই মানবচিত্তের সমৃদ্ধি।

"বর্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদভাসিত।"এর স্বরূপ নির্ণয়ে স্বচ্ছ ইতিহাসদৃষ্টির পরিচয় প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যুরোপের আছে প্রবল প্রাণশক্তি সেই উদ্যম তাকে ঘরছাড়া করেছে- দেশে দেশে তার বিজয় ঘোষিত।

যুরোপের মানুষ মোহমুক্ত জ্ঞানের সাধনায় তপস্বীর মতো। বিশুদ্ধ বুদ্ধি প্রয়োগ করে যুরোপ পেয়েছে প্রকৃতিজগৎকে- জেনেছে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির অজানা বিস্ময়রাজিকে।

বর্তমান যুগের চিতের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব ইতিহাসের আকাশ জুড়ে উদভাসিত। নিজের মধ্যযুগকে সে স্বীয় প্রচেষ্টায় জয় করেছে। জ্ঞানের জগৎ-এর প্রথম মশালটি যুরোপ। প্রাচ্যের সংস্কারাচ্ছন মনও এবার জাগল। তৈরি হল হিন্দু কলেজ, ইয়ং বেঙ্গল। 'নতুন শাসনে যে আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না'। এর আগে মুসলমান সম্রাটদের ধারণায় মানুষের ভাবনায় দিল্লিশ্বর হলেন জগদীশ্বরের তুল্য। সেই বিশ্বাস ধসে গেল। মুসলমান সাম্রাজ্য শেষ হল। আমাদের মানসমুক্তিতে ইংরেজদের ভূমিকা অনন্য।

যখন বায়রণ, শেলী, কীটসের কবিতা কার্লাইলের মনীষায় নিষ্ণাত, ভারতবর্ষ তখন রসম্ভোগেই যে রেনেসাঁসের প্রদীপ্ত মানুষরা আনন্দ পেয়েছে তা নয়- সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধ জাগল তাদের প প্রতিবাদী সত্তা। এই মুক্তি আনল ইংরেজ। ভারতবাসী অদৃষ্টবাদী। সেদিকে দৃষ্টি রেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - "ভগ্যনিদিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তি মানেই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবল শক্তি।"

কালপ্রবাহ সর্বদা গতিমান। ইতিহাসও চলেছে অগ্রসর হয়ে কালের বিবর্তনের পথে য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সহযোগিতা হল। কিন্তু ভারতবর্ষ বিদেশী নায়কদের অন্যায়

মানতে পারেনি। পাশ্চাত্যের সঙ্গে মিলনে ও সংঘাতে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশ জাপান অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বজাতিসংঘে নিজের স্থান করল পাকা। প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেছে। অথচ ভারত ভাগ্যবিধাতার অপ্রসন্ন, মুখচ্ছবিতে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত। "যুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠমানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে যুরোপের সংস্রবে। নবযুগের সূর্যমন্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।"

একদিন ছোট ইংরেজ বিজিত ভারতবর্ষকে রেখেছে পায়ের তলায়। বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যেই বিজিত জাতির পথ হবে প্রশস্ত। এমন চিন্তাও দুর্লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু জাগরণের মোহভঙ্গ ভারতবাসীকে জাগালো স্বাধীনতার পথে। অবিশ্বাস, সংশয়, অনাস্থা ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজ সহযোগিতার মূল হল ইংরেজরা ভারতবর্ষে চেয়েছে ল অ্যাণ্ড অর্ডার। ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিয়েছে তারা। সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য অত্যাচারকে দিল শাসনের ভূমিকা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তির্যক ব্যঙ্গ যেন তাঁর কবি স্বভাবের বিপরীত বজ্রবাণী। তিনি জানতেন "ইতিহাসে, যখন প্রভাত হয় সূর্য তখন পূর্ব দিকে ওঠে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে, উত্তর দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে আলো ছড়াইয়া পড়ে।"

ইংরেজ শাসনের এই অমানবিক অন্তঃসারশূন্যতার শেষ হবেই। "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।" কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ দেখে যাচ্ছেন দ্বিধাজীর্ণ, অনৈক্যে জর্জরিত পলিটিকসের আখড়া ভারতবর্ষকে। তবু রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী। "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।" মানুষ দেবতা হবেই।

"নিদারুণ দুঃখরাতে

মৃত্যুরাতে

মানুষ চুর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা

তখন দিবে না দেখা দেবতার

অমরমহিমা

তাই বলেছেন আসছেন সেই মহামানব জগতের ত্রাণকর্তাঃ-

আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ সার্থক। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন বা সঙ্গীতকারই নন তিনি আমাদের চিন্তানায়ক। ইতিহাসের বহু পঠনশীল পাঠক রবীন্দ্রনাথের ছিল প্রজ্ঞার দৃষ্টি। এর বিষয়বস্তু বিচিত্র হলেও ভাবৈকের সময়তা প্রবন্ধগুলিকে আলাদা করেছে। কালাতিক্রমনেই রবীন্দ্রনাথের কালান্তর সার্থক। ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত দলিল এই 'কালান্তর' প্রাবন্ধগ্রন্থ। মহাকবির হাতের প্রবন্ধের Objectivity ও উপমাপ্রয়োগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

১৩.৫। কালান্তরের শিল্পকৌশল

রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' গ্রন্থের প্রবন্ধশুলি এক বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের পর্বে লেখা। ইংরেজ শাসনের সব দোষত্রুটি কৃত্রিম গরিমা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ মত খুবই কালোচিত। স্বাধীনতার আগমন অনিশ্চিত। সমাজের ক্ষত প্রকট। অবুদ্ধি কুসংস্কার দেশকে শেষ করে দিচ্ছে। এই সংকটের ঘূর্ণাবর্তে কবির মন আলোড়িত।

কালান্তরের প্রকাশভঙ্গী অনবদ্য। দৃপ্ত এর বিষয়-কাব্যময়তা নেই উজ্জ্বল, উপমালোক আছে। আছে পত্র সাহিত্যের আঙ্গিক 'হিন্দু মুসলমান' ও 'বাতায়নিকের পত্রে'। বিশ্বের রাষ্ট্রনীতি ও দেশের রাষ্ট্রনীতিতে তাঁর মননশীল চিন্তা অমোঘ। কিছুটা নিষ্ঠুর ভবিষ্যদ্বাণীও আছে যা বর্তমানে সফল হয়েছে।

প্রবন্ধ সাহিত্য দুরকম- ব্যক্তিগত ও বস্তুগত। বস্তুগত প্রবন্ধে বিষয়বস্তু প্রাধান্য পায়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের নিজস্ব ভাবনা চিন্তা ও বলার ভঙ্গী হয় মুখ্য। কালান্তরের প্রবন্ধ বস্তুগত প্রবন্ধ। কিন্তু এতে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা ও রচনাভঙ্গী নিজস্ব। এতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের রেশ অনুভবও করা যায়। বস্তু উপলক্ষ, লেখকের ব্যক্তিত্ব মুখ্য।

সাহিত্যের বাণী তিনরকম- প্রভুসম্মিত, সুহৃৎসম্মিত ও কান্তাসম্মিত। স্বদেশ, সমাজ, রাজাপ্রজায় আছে রবীন্দ্রনাথের সুহৃৎসম্মিত বাণী। প্রভুসম্মিত কণ্ঠস্বর কালান্তর গ্রন্থেই লভ্য। সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার চরম স্তরে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে দেশে যে আসন

পেয়েছেন তা অভিভাবকের আসন। সেই আসন থেকে কবি জীবনের সায়াহ্নে জাতিকে যে কথা শুনিয়েছেন তার মধ্যে নিবেদন নেই আছে কর্তৃত্ব ও কঠোর তিরস্কার। এ আমাদের প্রাপ্য ছিল। বর্তমান ভারতে রবীন্দ্রনাথের কালান্তরের চিন্তাই ফলবতী হল বলাবাহুল্য মনীষীর বাক্য ব্যর্থ হয় না। Goethe বলেছেন- 'East and west can never be separated' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বর্তমানের চেহারা যেমনি হোক তবু এই আশা পূর্বের সঙ্গে পশ্চিম মিলিবে"। আছে সুরচিত শ্লোক এর প্রবন্ধে। ভাষার সৌন্দর্য অতুলনীয়।

১৩.৬। সভ্যতার সংকট: মূল প্রবন্ধ পাঠ

সভ্যতার সংকট আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে। বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজজাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্যপরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগিতায়, মেকলের ভাষা প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত সেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রণের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজজাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির

দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচারপ্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যার স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজচরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেইসময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেণ্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে-বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে-প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমানকালের অনভিজ্ঞতার

মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে-সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

'সিভিলিজেশন', যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে-রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। এই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যেদেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক। এই কারণে

প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচারব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে-আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যালে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার অাদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যার চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য উগ্র হয়ে উঠল।

যে-যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত, অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কী রকম সম্পদবান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি

আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য শাসনের রূপ আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়। সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতি বিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল—দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগবাঁটোয়ার নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতের উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে—এক ইংরেজ, আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী ক'রে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে-সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এইরকম গবর্নমেণ্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুষ্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এককালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটে নি কিন্তু তার সম্ভাবনা

অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ—সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজো অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চারদিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দলপাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্য। চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে একসময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র গভর্নমেন্টের তলায় ইংলণ্ড কী রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয় নি তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারি এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে সে যদি ভারত-শাসনযন্ত্রের উর্ধ্বস্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তাহলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনে অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই

প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বল, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে-সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজজাতির প্রতি আজো বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এণ্ড্রুজের নাম করতে পারি; তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণবয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশনের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম আমার শেষবয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি এঁদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু বলে মান্য করি। এঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্ত্বকে এঁরা সকলপ্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তাহলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমনসময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিস্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম-আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি ।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ।।

ঐ মহামানব আসে,

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে

মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,

নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,

এল মহাজন্মের লগ্ন।

আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত

ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।

উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব

নবজীবনের আশ্বাসে।

জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়

মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

১৩.৭। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধের বিষয়বস্তু

বিশ্বমানবিকতার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ স্বতই চলেছেন তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়ে। চন্ডীদাসের বাণীই রবীন্দ্রনাথের জীবনে চিরসত্য 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' সাংস্কৃতিক মহাসম্মেলনই ভারতবর্ষের কাঙ্খিত। বিশ্ববিবেক রবীন্দ্রনাথ বলেন ভারতে আছেন 'নরদেবতা'- কবিতাতেও বলেছেন 'নমি নরদেবতারে'। জীবদ্দশায় বিশ্বের যে সমস্ত রাষ্ট্রিক সঙ্কট প্রত্যক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেগুলি হল:

১। সন্ত্রাসবাদ।

২। দমন, পীড়ন, শোষণ ও উপনিবেশবাদ।

৩। ন্যাশনালিজম্ ছড়াও ছিল নাৎসিজম্।

৪| দুই বিশ্বযুদ্ধে মানবসভ্যতার চূড়ান্ত সঙ্কট।

৫। অনগ্রসর রাষ্ট্রের ওপর শক্তিশালী রাষ্ট্র লাফিয়ে পড়ছে।

৬। ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতে সৃষ্টি করছে ভেদ ও ধর্মবিদ্বেষ।

৭। ভারতের মতো দরিদ্র নিঃস্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আত্মবিচ্ছেদ ও আত্মপরাভবের ঘটনা।

প্রাচ্য জাতির মধ্যে 'য়ুরোপের সর্দার পোড়ো' জাপান প্রাচ্যের কোরিয়া ও চীনের ওপর নির্মম অত্যাচারে নষ্ট করছে তাদের ভরিষ্যৎ। ইউরোপের নানাস্থানেই ফ্যাসীবাদের বর্বরতা অবর্ণনীয়। একই ধরনের বীভৎসতা পাওয়া গেছে আয়ারল্যান্ডে। ফ্যাসীবাদ য়ুরোপে তীব্র। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানি কবি নোগুচিকে প্রতিবাদমুখর চিঠি লিখলেন রবীন্দ্রনাথ- 'You are building your conception of an Asia which would be raised on a tower of skills.' ইংল্যাণ্ড স্পেনের ওপর চালিয়েছে নির্মম অত্যাচার শুধু ষড়যন্ত্র করে। রাষ্ট্রস্বার্থ উগ্রজাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রকে যুদ্ধের উন্মাদনার দিকে ঠেলে দেয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাপ্তাহিক উপাসনায় বললেন এই সংকটের কথা -

সমস্ত ইউরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইতালি আফ্রিকার সুপ্রাচীন দেশে ইথিওপিয়ায় আক্রমণ চলে। কবি অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে এই সময় আফ্রিকা কবিতাটি লেখা হয়। জেনারেল ফ্রাংকো ১৯৩৬ সালে স্পেনের গণতন্ত্রের ধবংসের নেতা । তখনও গর্জে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ 'Help the people's front in spain. cry in million voices - to the success of civilization and culture। ১৯৩৯

সালের ৩০ নভেম্বর রুশরা ফিনল্যাণ্ডে বোমা বর্ষণ করে। দারুণ মর্মাহত কবি-হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ পেল ভাষায়

'ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল

সোভিয়েত বোমার বর্ষণে'।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । জঙ্গী রাষ্ট্রনায়ক হিটলার শাসিত জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে নেয়। চেকদের বিপদ কাটেনি আঘাত হানে তাদের ওপর পোল্যাণ্ড। য়ুরোপের ইতালির মুসোলিনি ও জাপানের তোজোর তখন গভীর বন্ধুত্ব। যুদ্ধের সূচনায় হিটলারের সঙ্গে স্তালিনের মিত্রতা রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মনকে আহত করে। কবির কবিতায় এই দারুণ জোটবদ্ধতার পেছনে ছিল গভীর অসন্তোষ। তাই লিখছেন :

ঐ শোনা যায়

রেডিওতে

বোঁচা গোঁফের হুমকি,

দেশ বিদেশে শহরে গ্রামে

গলা কাটার ধূম কি।

ফিনিক্স পাখীর মতো কবি আগুন থেকে নির্যাতিত মানবতার প্রতি তাঁর বিশ্বাস করেছেন ব্যক্ত। অপরদিকে ভারতবর্ষের চিন্তা ও অশীতিপর রবীন্দ্রনাথের ধীশক্তির ওপর আঘাত হেনেছে বারবার :-

"my countrymen will truely gain their india by fighting against the education which theches them data country is greater than the ideals of humanity."

রাশিয়ার মস্কো নগরীতে শিক্ষাবিস্তার দেখে কবি ছিলেন মুগ্ধ। মুসলমান ও অমুসলমানে বিরোধ নেই। ইংরেজ পরজাতিলোলুপ। সকল বিষয়ে মানুষের সহযোগী রুশরা। তাই

'এদেশে (রাশিয়ায়) এসে এ জন্মের তীর্থদর্শন সমাপ্ত হল' এ কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পারস্যে য়ুরোপের দুই জাতি পীড়ন পেষণ কম করেনি। কিন্তু মানুষ অত্যাচার সহ্য করে না। পারস্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুর্বলজাতি বলেই পরিগণিত 'On jan 29, 1942 Great Britain the U.S.S.R and Persia coneluded a treaty of alliance' দুটো শক্তিই শেষ পর্যন্ত জার্মানদের অশুভ প্রভাব থেকে পারস্যকে রক্ষা করে (Encyclopacdia Britanica , Vol-17) পারস্যে ইঙ্গ ইংরেজ বাহিনী তেল কোম্পানী তৈরি করেছিল একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী অপরদিকে রুশ শক্তি গোষ্ঠী পারস্যে প্রাধান্য বিস্তার করলেও শেষ পর্যন্ত পারস্য মুক্ত হয়। আমাদের প্রতিবেশি আফগানিস্তানের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজনীতির উৎকর্ষ ঘটেনি। কোন বিদেশী শক্তি সেখানে পদাপণ করেনি। তবুও ভারমুক্ত আফগানিস্তান উন্নতি করেছে নানাভাবে। যদিও সম্প্রতি আফগানিস্তানে আমেরিকা তালিবানি শাসন উচ্ছেদের জন্য হামলা চালিয়েছে। চীনদের অহিফেন পাঠিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের জড়তাসম্পন্ন জাতিতে রূপান্তরিত করেছে। 'সত্যতার প্রতি বিশ্বাস কী করে হারানো গেল'।

১৩২১ সালে 'পাপের মার্জনা' প্রবন্ধে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ – "আমরা তাঁর কাছে, এ প্রার্থনা করতে পারি না আমাদের পাপ ক্ষমা করো..... মানুষের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। ..... কারণ অতীতে ভবিষ্যতে দুর দূরান্তরে মানুষ যে পরস্পর গাঁথা হয়ে আছে।"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল ইংরেজ সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে আমাদের আঙ্গিক উন্নতির ধারক তারা হবে। ভারত কি লাভবান হয়নি পাশ্চত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের স্পর্শে। ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, ইংরেজ পার্লামেন্টের বাগ্মীরা পরাধীনতার বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। ভারতবর্ষে যে সব ইংরেজ মনীষী শিক্ষা বিস্তারে সামাজিক উন্নতিবিধানে অগ্রসর হন তাদের সঙ্গে শাসক বেনে ইংরেজদের মিল নেই। এরা অর্থপিশাচ। পরাধীন মানুষের প্রতি এদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সীমাহীন। তাই

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভক্ষুধানল

তত তার বেড়ে ওঠে- বিশ্বধরাতল

আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার

জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার

****

ছুটিয়াছে জাতি প্রেম মৃত্যুর সন্ধানে

বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

ভুলে গিয়েছেন কবি ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড নিয়ে পররাজ্যে গিয়ে সেখানে রাজদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে আক শোষণ তাদের জাতিগত বৈশিষ্টা। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আনন্দে ভুলে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিকতার বোধ, পরে জাগল Nationalism থেকে Internationalism (সভ্যতার সঙ্কটে) প্রবল জাতির অত্যাচারে কবি মর্মাহত। অতিরিক্ত উগ্র জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করে জীবনের সব সত্যকে। বিশ্বকে ঠেলে দেয় অন্তহীন বিনাশের পথে।

রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ বললেন তাঁদের সময় উদার মানসিকতা এবং সংস্কৃতিচর্চার প্রায় সব উপকরণই জুগিয়েছে শাসক ইংরেজরা। অথচ জীবনের এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন- "এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভেতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কুলষিত করে দিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথ সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন - "যখন সভ্য জগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেন তখন কোনও দিন সভ্য নামধারী মানবাদর্শের এত বড় নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনাই করতে পারিনি, অবশেষে দেখছি একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহু কোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্য জাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য"।

'বিশ্বমানবতাবাদে' উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ। প্রবলের উদ্ধত অন্যায় ইংরেজদের প্রতি মোহভঙ্গ হয় রবীন্দ্রনাথের ।

তিনি আশঙ্কা করেন, এই সর্বনাশ যুদ্ধের অবসান হবে না। কবির আস্তিক্যবোধ বিশ্বমানবধর্মে আস্থা বরাবর স্থিতিশীল ছিল। প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় (১৮ সংখ্যক ২৫.১২.৩৭) এ লেখা কবিতায় তিনি ২য় বিশ্বযুদ্ধের আভাস পান -

'নাগিনীরা চারদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস

শান্তির লালিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।'

বিদায় লগ্নেও এই আহ্বানের বিশ্বাস তাঁর ছিল-

'বিদায় নেবার আগে তাই

ডাক দিয়ে যাই

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে

প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

Nationalism in japan গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন "does not the voice come to us through war, the shrieks of hatred the wailing of despair" শেষ পর্যন্ত লিখলেন – "আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্রলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দেববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি- পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর, উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ।

কিন্তু, কবি তবু বিশ্বাস রেখেছেন "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।" তার পরেই আছে বাক্য-

'অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।।'

'অধর্মের দ্বারা অগ্রগতি হয় না, এর ফলে ধর্মের দ্বারা ভদ্র বা মঙ্গল লাভ হয়। এর ফলে শত্রুকে জয় করা যায়। অধর্ম আশ্রয় করলে মানুষ সমূলে বিনষ্ট হয়। (অনুবাদ- অধ্যাপক উদয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) কাজেই রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা-

ওই মহামানব আসে।

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে

মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,

নবলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,

এল মহাজন্মের লগ্ন।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই পৃথিবীতে মানুষ প্রতীক্ষারত কবে আসবেন সেই মহামানব যখন পৃথিবী আবার তরুণী হবে। মুছে যাবে পাপ তাপ দুখ, বেদনা। রবীন্দ্রনাথের মানুষের প্রতি বিশ্বাসই প্রমাণ করছে পৃথিবীটা এখন যুদ্ধের কুরুক্ষেত্র কিন্তু শ্রী অরবিন্দের মতে পৃথিবী হবে বৃন্দাবন- ভালোবাসা ও পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রে ঐক্যসাধন হবে।

১৩.৮। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবনা

মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে নিজের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে-অভিভাষণ রচনা করেন, তার নাম দিয়েছিলেন সভ্যতার সংকট। জন্মোৎসবে সেটি পাঠ করে শোনান ক্ষিতিমোহন সেন। এর একটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন ক্ষিতীশ রায়, তা পরিমার্জনা করেন কৃষ্ণ কৃপালনী এবং চূড়ান্তভাবে দেখে দেন রবীন্দ্রনাথ। শুনেছি, এর শিরোনাম Crisis of Civilization হবে না Crisis in Civilization, তা নিয়ে মতান্তর ছিল। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শেষের নামটিই পছন্দ করেন। এ-কথার উল্লেখ করলাম

এই আশায় যে তা থেকে বক্তৃতার বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।ভাষণটির গোড়ার দিকেই রবীন্দ্রনাথ বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা যদিও সিভিলিজেশন শব্দটির তরজমা করে নিয়েছি সভ্যতা বলে, তবু ওই ইংরেজি শব্দের যথাযথ প্রতিশব্দ 'আমাদের ভাষায়'পাওয়া সহজ নয়। 'এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার।'ভারতবর্ষের যে-অংশ 'ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার।'আমরা যখন ছোটো ছেলেকে বলি 'সভ্য হয়ে বসে থাকো' কিংবা কাউকে বলি 'অসভ্যতা কোরো না', তখন সভ্যতা অর্থে এই সদাচারই বোঝায়। তবে সেই সদাচার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ছিল তীব্র এবং তার বদলে নতুন একটা আদর্শ গ্রহণের তাগাদাও ছিল প্রবল :এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত – তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে হরণ করেছিল। ...আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।... এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে, কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম – সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।জীবনের প্রথমে ইংরেজের যে-ঔদার্যে রবীন্দ্রনাথ আস্থা পোষণ করেছিলেন, পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখতে পেলেন, ইংরেজ শাসনাধীন দেশের মানুষের জন্যে তার প্রয়োগ নেই। যে-ভারতবর্ষ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে, সে-ভারতবর্ষেরই হৃদয়বিদারক অভাব অন্ন-বস্ত্র-পানীয়-শিক্ষা-আরোগ্যের। 'সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই' পারেননি তিনি। সোভিয়েত রাশিয়া ও পারস্যের সঙ্গে এই অবস্থার প্রতিতুলনা করেছেন তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে

রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে যেসব মরুচর মুসলমান জাতির, তাদেরকে সকল দিক দিয়ে শক্তিমান করে তোলার নিরন্তর অধ্যবসায় দেখেছেন রাষ্ট্রের। আরো দেখেছেন, রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে মুসলমান-অমুসলমানে কোনো বিরোধ ঘটে না। তেমনি জরথুস্ট্রিয়দের সঙ্গে মুসলমানদের যে-সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা পারস্যে ছিল এককালে, ইউরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম ঘটেছে। এমনকি, আফগানিস্তানকে সভ্যতাগর্বিত কোনো ইউরোপীয় জাতি আজো অভিভূত করতে পারেনি বলে, শিক্ষা ও সমাজনীতির সার্বজনীন উৎকর্ষ না ঘটা সত্ত্বেও, তার সম্ভাবনা সেখানে অক্ষুণ্ণ। কবির মতে, 'এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।'ইংরেজদের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে কেবল ভারতবর্ষই নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে তলিয়ে পড়েনি, চীনাদের মতো এতবড়ো প্রাচীন সভ্যজাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থ-সাধনের জন্যে বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে চীনের অংশবিশেষ আত্মসাৎ করে নিয়েছে। অবশ্য জাপানও যে উত্তর চীনকে গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত, তাও রবীন্দ্রনাথ ভোলেননি। দ্বন্দ্বটা যে কেবল ইউরোপীয়-অন-ইউরোপীয় নয়, তা যেমন বোঝা যায় জাপানের আগ্রাসী ভাব থেকে, তেমনি স্পেনের প্রজাতন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে ইংরেজের কূটকৌশল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত থেকে।এতসব কালো মেঘের মধ্যেও রুপোলি আভা দেখা গিয়েছিল। সে হলো স্পেনের জন্যে কিছুসংখ্যক ইংরেজ বীরের আত্মত্যাগ। এমন ইংরেজ মিত্র ভারতবর্ষও লাভ করেছে। ইংরেজের এই মানবহিতৈষী চরিত্রকেই একদা রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমসাময়িক অনেকে বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে মান্য করেছিলেন। কিন্তু সে-বিশ্বাস কেমন করে হারাতে হলো, তার কথাই জানালেন এই অভিভাষণে। 'সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যর শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে।' রবীন্দ্রনাথ জানেন, এই দুর্গতির জন্যে আমাদের সমাজকেই দায়ী করা হবে, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস, 'এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত-শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরের কোনো-এক গোপন কেন্দ্র থেকে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-

ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না।'এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জাপানের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেখানে এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব নেই। আরো একটি বিষয়ে তিনি ভারতবর্ষ ও জাপানের তুলনা করেছেন। যে-যন্ত্রশক্তির কল্যাণে জাপান সর্বতোভাবে সম্পদবান হয়ে উঠেছে, যে-যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ নিজের বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে, 'তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত।' রবীন্দ্রনাথ সখেদে বলেছেন,এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার বদলে দন্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।তিনি ভৎর্সনা করেছেন, 'এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।'পরিশেষে কবি যা বলেছেন, তাঁর মুখের ভাষায় তা না শুনলে তার বেদনাসুন্দর প্রকাশ উপলব্ধি করা যাবে না :ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি – পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত

থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিমানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।তাই এত দুঃখের মধ্যেও তিনি আশার কথা জানিয়েছেন, আস্থার কথা বলেছেন।রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর সাত দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রস্থানও ঘটেছে প্রায় সাত দশক পূর্বে। তার পরও সভ্যতার সংকট এখনো প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক শুধু তার ইতিহাস-বিশ্লেষণের কারণে নয়। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের যে-ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তা আজো নির্মমভাবে সত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে যদিও আর মহাসমর সংঘটিত হয়নি, তবু এমন সময় যায়নি যেখানে আমরা মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে সংঘাত দেখিনি। এশিয়া মহাদেশ তার মূল ঘটনাস্থল, তবে ইউরোপ, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকাও তার থেকে বাদ যায়নি। বৃহৎ শক্তির লোভ মানুষের শান্তি ও সম্পদ হরণে ক্ষান্তিহীন। সভ্যতার দাবি আবার তাদেরই প্রবল। কোথাও সংঘর্ষ দেখা দিলে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে শক্তিমান দেশগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আবার তারাই যুদ্ধরত জাতিগুলোর কাছে মারণাস্ত্র বিক্রি করে সে-সংঘাতকে প্রলম্বিত করার ব্যবস্থা করছে। সভ্যজাতির ক্ষেত্রে এবং অপরের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিতের মাপকাঠি তাদের কাছে এখনো ভিন্ন। আমরা যখন যুদ্ধাপরাধের জন্যে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করি. তখন তারা আন্তর্জাতিক মানের কথা বলে বারবার। তারা যখন ওসামা বিন-লাদেনের গোপন আস্তানায় বলপূর্বক প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দেয় তখন আর কোনো মানের প্রশ্ন ওঠে না। সভ্যজাতির এই ভাবলেশহীন দ্বিচারণ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৯১৭ সালে Nationalism বইতে তিনি প্রথমবার পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বার্থপরতার কথা বলেছিলেন, এবং তার অনুকরণে জাপানের মতো প্রাচ্যদেশেও যে-অনাচার ঘটছিল, তার নিন্দাজ্ঞাপন করেছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সভ্যতার সংকটে শেষবারের মতো মানুষের প্রতি কৃত মানুষের অবিচার-অন্যায়ের একটা সূত্রবদ্ধ পরিচয় তুলে ধরলেন এবং মানুষের ওপরেই আস্থা রাখলেন সেই সংকট থেকে মুক্তিলাভের। এসব কথা অবিনাশী, এসব কথা কালোত্তীর্ণ।

১৩.৯। অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার ক্রম পরিণতি পাওয়া যায় কালান্তর প্রবন্ধে- আলোচনা করুন।

২। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ কালান্তরের বিচিত্রমুখী চিন্তার পরিচয় দিন।

৩। 'কালান্তর'-এর নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা করে প্রসঙ্গত কালান্তরের শিল্পকৌশল সম্পর্কে আপনার অভিমত দিন।

৪। 'কালান্তর' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

৫। ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তর সম্পদের ওপর রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের কথা আছে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তা উক্ত প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৬। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

৭। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের পরিচয় দিন।

১৩.১০। গ্রন্থপঞ্জি

১। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন - বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

২। রবীন্দ্রনাথ - অন্নদাশঙ্কর রায়।

৩। প্রবন্ধ সংগ্রহ - প্রমথ চৌধুরী।

৪। কালান্তর আলোচনা - ঊষা পাবলিকেশন।

৫। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা - চিন্মোহন মেহানবীশ।

৬। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা - নেপাল মজুমদার।

৭। রবীন্দ্রনাথের কালান্তর - অলোক রায়।

একক: ১৪। রবীন্দ্র প্রবন্ধ: মানুষের ধর্ম-১ ও অন্তর বাহির

বিন্যাসক্রম

১৪:১। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য

১৪.২। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয়

১৪.৩। মানুষের ধর্ম-১ : মূল প্রবন্ধ পাঠ

১৪.৪। 'মানুষের ধর্ম-১' প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়

১৪.৫। 'মানুষের ধর্ম-১' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা

১৪.৬। মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

১৪.৭। অন্তর বাহির : মূল প্রবন্ধ পাঠ

১৪.৮। অনুশীলনী

১৪.৯। গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য

সমগ্র রবীন্দ্রজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি অপূর্ণ থেকে পূর্ণতার অভিসারী। প্রতিটি জীবই পূর্ণতাকামী, অমৃতের অভিমুখী। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের কথা তিনি বলেছেন। পৃথিবীতে চারিদিকে লোভের ফাঁদ পাতা, সেখানে মানুষের মানবিক মর্যাদা ক্ষুন্ন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এরই মাঝে পথ চিরে পাড়ি দেওয়ার ও উত্তরণের মন্ত্রটি আমাদের ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর একটা বিশ্ব ভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতিকে আঁকড়ে চলেছে,

আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্র ভাবনার দুই ঐতিহাসিক মাত্রা, একটি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত, আর এক দেশ-কালে পরিব্যাপ্ত। তিনি সাহিত্যে মানবের কথা বলেছেন, বলেছেন মানুষত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের কথা। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের ধর্ম কোন সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ ধর্ম নয়, তা নিত্য শাশ্বত মানবধর্ম। এই বোধ জাতি সম্প্রদায়হীন বৃহৎ মানব সত্তার আত্মোপলব্ধি। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধ পাঠ করলে বাধা-বন্ধহীন শাশ্বত মানবধর্ম, লেখকের উদার বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা কৌশল সম্পর্কে অবহিত হতে পারি।

১৪.২। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'কমলা-বক্তৃতা' দিয়েছিলেন ১৯৩৩-এর ১৬, ১৮ ও ২০ জানুয়ারি। এই ভাষণগুলি 'মানুষের ধর্ম' শিরোনামে ১৯৩৩ সালের মে মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'মানুষের ধর্ম' - গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'মানবসত্য' কমলা বক্তৃতার অনুবৃত্তিরূপে শান্তিনিকেতনে কথিত এবং প্রবাসী পত্রিকার ১৩৪০ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত। প্রসঙ্গসূত্রে উল্লেখ করতে হয়, ১৯৩০-এর মে মাসের ১৯, ২৯ ও ২৬ তারিখে অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট-বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর এই বক্তৃতা 'The Religion of Man' নামে ১৯৩১-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 'মানুষের ধর্ম' ইংরেজি ভাষণের ('The Religion of Man' গ্রন্থের) সারসংকলন এবং আক্ষরিক অনুবাদ নয়। তবে ভাষণের শিরোনাম এবং বিষয়বস্তু একই। 'মানুষের ধর্ম' - গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তৃতার সারসংকলনপূর্বক রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে তিনটি বক্তৃতা দেন অন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৩ সনের ৮, ৯,ও ১০ ডিসেম্বর তারিখে। এই ভাষণ তিনটি The Visva-Bharati News (May 1934) ও The Modern Review (August এবং September 1934) -তে যথাক্রমে 'Man', 'Supreme Man' এবং 'I am He' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছিল।

'মানুষের ধর্ম' - গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে বলেছেন :

মানুষের একটা দিক আছে সেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনইয়াত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবন রূপে বাঁচতে চায়। কিন্ত, মানুষের আর-একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত - প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এতো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তা হলে এর জন্যে সাধনা করতে হত না। আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে ‘সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ’, তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তার প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেকস্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি। কিন্তু, তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করছে, তাকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহতিনা’। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে -

“স দেবঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার

এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।"

অর্থৎ, ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে একটি সর্বকালীন ও সর্বজনীন মানবতার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন তাঁর অভিমুখে অগ্রসর হওয়াকেই মানুষের ধর্মীয় সাধনা বলেছেন, 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে এরূপ সাধনার গভীর পরিচয় ফুটে উঠেছে।

'The Religion of Man' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিকে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে একটি সর্বকালীন ও সর্বকালীন মানবসত্তার অভিমুখে যাত্রাই মানুষের ধর্মসাধনা - তাঁর দার্শনিক মননের ফল বলে নির্দেশ করছেন না রবীন্দ্রনাথ, তিনি বলেছেন এ তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় অনুভব এবং সেই হিসেবে দর্শনের থেকে এর মূল্য অধিক। 'ছিন্নপত্রাবলী'র একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে, কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী - বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিষটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরম সত্য।" (পত্রসংখ্যা : ২৩৮)

১৪.৩। মানুষের ধর্ম-১ : মূল প্রবন্ধ পাঠ

মানুষের ধর্ম – ১

পথ চলেছিল একটানা বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না। পৌঁছল এসে ঘরে, সেখানে অর্থ পাওয়া গেল, আরম্ভ হল ভিতরের লীলা। মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টিব্যাপার, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটল, অন্তরের দিকে বইল তার ধারা। অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়। বুঝতে পারে, বহুর মধ্যে সে এক; জানে, তার নিজের মনের জানাকে বিশ্বমানবমন যাচাই করে, প্রমাণিত করে, তবে তার মূল্য। দেখতে পায়, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই

সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা। তাই মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। বুদ্ধির বর্বরতা তাকেই বলে যা এমন মতকে, এমন কর্মকে, সৃষ্টি করে যাতে বৃহৎকালে সর্বজনীন মন আপনার সায় পায় না। এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁচেছে বিশ্বমানসলোকে। যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি। সফলতালাভের জন্যে সে মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম নিয়ে বাহ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিল; অবশেষে সার্থকতালাভের জন্যে একদিন সে বললে, তপস্যা বাহ্যানুষ্ঠানে নয়, সত্যই তপস্যা; গীতার ভাষায় ঘোষণা করলে, দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়; খ্রীষ্টের বাণীতে শুনলে, বাহ্য বিধিনিষেধে পবিত্রতা নয়, পবিত্রতা চিত্তের নির্মলতায়। তখন মানবের রুদ্ধ মনে বিশ্বমানবচিত্তের উদ্‌বোধন হল। এই তার আন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে দেশে কালে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের দিকে প্রসারিত। এই বোধেরই শেষ কথা এই যে, যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে সেই জানে সত্যকে।

মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব। ঋগ্‌বেদে সেই

বিশ্বমানবের কথা বলেছেন; পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি — তাঁর এক-চতুর্থাংশ আছে জীবজগতে, তাঁর বাকি বৃহৎ অংশ ঊর্ধ্বে অমৃতরূপে।

মানুষ যে দিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতিকে, প্রত্যক্ষকে, অতিক্রম ক'রে সত্য সেই দিকে সে মৃত্যুহীন; সেই দিকে তার তপস্যা শ্রেষ্ঠকে আবিষ্কার করে। সেই দিক আছে তার অন্তরে, যেখান থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করে, রূপদান করে সকলের আনন্দকে। যে পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট; সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর।

মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ; তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অণুবীক্ষণযোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারি দিকে ফাঁক। এক দিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর-এক দিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ; সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোষের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরম রহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের আত্মনিবেদন। যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবনসীমায় বর্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য কিছুই নেই। কিন্তু, যেখানে তারা নিজের জীবনসীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য, সেখানে তারা আপন স্বতন্ত্র জন্মমৃত্যুর মধ্যে বদ্ধ নয়। সেইখানেই তাদের সার্থকতা। শোনা যায়, প্রতি সাত বছর অন্তর মানুষের দেহে এই জীবকোষগুলির পরিবর্তন ঘটে। তারা বিদায় নেয়, অর্থাৎ তাদের পৃথক সত্তা থাকে না। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সত্তা সমস্ত দেহের আয়ুর অন্তর্গত, অর্থাৎ যেটা তাদের স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক, সেই সত্তা সমস্ত দেহের জীবনপ্রবাহে থেকে যায়।

দেহে কখনো কখনো কর্কটরোগ অর্থাৎ ক্যান্সার জন্মায়; সেই ক্যান্সার একান্তই স্বতন্ত্র, বলা যেতে পারে তার মধ্যে দেহাত্মবোধ নেই। সমগ্র দেহের সে প্রতিকূল। দেহের পক্ষে একেই বলা যায় অশুভ।

মানুষের দেহের জীবকোষগুলির যদি আত্মবোধ থাকত তা হলে এক দিকে তারা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদেরকে স্বতন্ত্র জানত, আবার বৃহৎভাবে নিজেদেরকে জানত সমগ্র দেহে। কিন্তু জানত অনুভবে, কল্পনায়; সমগ্র দেহকে প্রত্যক্ষত ও সম্পূর্ণত জানা সম্ভব হ'ত না। কেননা এই দেহ শুধু যে বর্তমানে অধিষ্ঠিত তা নয়, এই দেহে রয়েছে তার অতীত, অপেক্ষা করছে তার ভবিষ্যৎ। আরো একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী কল্যাণ, যাকে বলি স্বাস্থ্য, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। তা ছাড়াও সমগ্র জীবনরক্ষার গভীরতর চেষ্টা প্রত্যেক জীবকোষের আছে, যে চেষ্টা রোগের অবস্থায় সর্বদেহের শত্রুহননে নিজেদের আত্মহানিও ঘটায়, দেশপ্রেমিক যেমন করে দেশের জন্যে প্রাণ দেয়। এই চেষ্টার রহস্য অনুসরণ করলেই বোঝা যেতে পারে, এই ক্ষুদ্র দেহগুলির চরম লক্ষ্য অর্থাৎ পরমধর্ম এমন-কিছুকে আশ্রয় করে যাকে বলব তাদের বিশ্বদেহ।

মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'। সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তার ভৌতিক সীমা অতিক্রমণের মুখে। যাকে সে বলে ভালো, বলে সুন্দর, বলে শ্রেষ্ঠ — কেবল সমাজরক্ষার দিক থেকে নয় — আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির দিক থেকে।

ডিমের ভিতরে যে পাখির ছানা আছে তার অঙ্গে দেখতে পাই ডানার সূচনা। ডিমে-বাঁধা জীবনে সেই ডানার কোনো অর্থই নেই। সেখানে আছে ডানার অবিচলিত প্রতিবাদ। এই অপরিণত ডানার সংকেত জানিয়ে দেয়, ডিমের বাইরে সত্যের যে পূর্ণতা আজও তার কাছে অপ্রত্যক্ষ সেই মুক্ত সত্যে সঞ্চরণেই পাখির সার্থকতা। তেমনিই মানুষের চিত্তবৃত্তির যে ঔৎসুক্য মানুষের পূর্ণ সত্যের সাক্ষ্য দেয় সেইখানেই অনুভব করি তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র থেকে মুক্তি। সেইখানে সে বিশ্বাভিমুখী। জীবকে কল্পনা করা যাক, সে যেন জীবনযাত্রার একটা রেলগাড়ির মধ্যেই জন্মায়, বেঁচে থাকে এবং মরে। এই গাড়ি সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা গাড়ির নিম্নতলের সমরেখায়। গাড়ির সীমার মধ্যে তার আহারবিহারের সন্ধান চলছে নীচের দিকে ঝুঁকে। ঐটুকুর মধ্যে বাধাবিপত্তি

যথেষ্ট। তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানলা পর্যন্ত পৌঁছয় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে। মানুষ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানলা। জানতে পেরেছে, গাড়ির মধ্যেই সব-কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ হয়েও যা বাকি আছে তার আভাস পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না। যেটুকু আলো গাড়ির প্রয়োজনের পক্ষে যথোপযুক্ত, বাইরে তারই বিস্তার অবাধ অজস্র। সেই আলো তাকে ডাকে কেন। ঐ প্রয়োজনাতীত বাইরেটার প্রতি উদাসীন থাকলে ক্ষতি কী ছিল। দিন তো চলে যেত, যেমন চলছে হাজার লক্ষ প্রাণীর। কিন্তু মানুষকে অস্থির করে তুললে যে। বললে, তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতিনির্দিষ্ট সাম্রাজ্যপ্রাচীর লঙ্ঘন করে সে জয় করতে বেরোল আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রার পথে তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই; শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত করছে, উন্মুক্ত করছে।

দেহের দিকে মানুষকে বিচার করে দেখা যাক। সে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন কথা বলা চলে না যে, দাঁড়াবে না তো কী। দাঁড়ানো সহজ নয়। পাখির দেহের ছন্দটা দ্বিপদী। মানুষের দেহটা চতুষ্পদ জীবের প্রশস্ত ছন্দে বানানো। চার পায়ের উপর লম্বা দেহের ওজন সামনে পিছনে ভাগ করে দিলেই এমনতরো দেহটাকে একসঙ্গে বহন ও সঞ্চালন তার পক্ষে সহজ হতে পারত। কিন্তু, মানুষ আপন দেহের স্বভাবকে মানতে চাইলে না, এজন্যে সে অসুবিধে সইতেও রাজি। চলমান দীর্ঘ দেহটার ভাররক্ষার সাধনা করলে ঐ দুই পায়ের উপরেই। সেটা সহজসাধ্য নয়, ছেলেদের প্রথম চলার অভ্যাস দেখলেই তা বোঝা যায়। শেষ বয়সে বৃদ্ধকে লাঠির উপর ভর দিতে হয়, সেও একটা প্রমাণ। এও দেখা যায়, চার-পেয়ে জন্তু যত সহজে ভার বহন করতে পারে মানুষ তা পারে না — এইজন্যেই অন্যের ‘পরে নিজের বোঝা চাপাবার নানা কৌশল মানুষের অভ্যস্ত। সেই সুযোগ পেয়েছে বলেই যত পেরেছে ভার সৃষ্টি করেছে। তাকে পরিমিত করবার চেষ্টা নেই। মানুষের এই চালটা যে সহজ নয় তার দৃষ্টান্ত প্রায়ই পাওয়া যায়। ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে আশঙ্কা, জন্তুদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়,

ডাক্তারের কাছে শোনা যায় মানুষ উত্ততভঙ্গী নিয়েছে বলে তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়। তবু মানুষ স্পর্ধা করে উঠে দাঁড়ালো।

নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভূতি দেহবৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি। খাড়া-হওয়া মানুষের কাছে নিকটের চেয়ে দূরের দাম বেশি। অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে তার মন হয়েছে প্রবৃত্ত। এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি। শুধু দৃষ্টি নয়, সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতও পেয়েছে মুক্তি। পায়ের কাজ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত তা হলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মতো অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে। পুরাণে বলে, ব্রহ্মার পায়ের থেকে শূদ্র জন্মেছে, ক্ষত্রিয় হাতের থেকে।

মানুষের দেহে শূদ্রের পদোন্নতি হল ক্ষাত্রধর্মে, পেল সে হাতের গৌরব, তখন মনের সঙ্গে হল তার মৈত্রী। মানুষের কল্পনাবৃত্তি হাতকে পেয়ে বসল। দেহের জরুরি কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। জীবনযাত্রার কর্মব্যবস্থায় সে Whole-Time কর্মচারী রইল না। সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্বের রচনায় — অনেকটাই অনাবশ্যক। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের, আনন্দব্রহ্মের রাজ্য। এ রাজ্যে মানুষ যে কাজগুলো করে হিসাবি লোক জিজ্ঞাসা করতে পারে, "এ-সব কেন।" একমাত্র তার উত্তর, "আমার খুশি।" তার বিজ্ঞানে, তার সাহিত্যে, তার শিল্পকলায় এই এক উত্তর "আমার খুশি।"মাথাতোলা মানুষের এতবড়ো গর্ব। জন্তুদের যথেচ্ছ খেলার অবকাস আছে, কিন্তু জীবনে তাদের খেলাটা গৌণ। তা ছাড়া তাদের খেলাও প্রকৃতির অনুগত। বিড়ালছানার খেলা মিথ্যা ইঁদুর মিছামিছি ধরা, কুকুর-ছানার খেলা নিজের লেজের সঙ্গে লড়াই করার সগর্জন ভান। কিন্তু, মানুষের যে কাজটাকে লীলা বলা যায় অর্থাৎ যা তার কোনো দরকারের আমলে আসে

না, কথায় কথায় সেইটেই হয়ে ওঠে মুখ্য, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণযাত্রাকে। সেইটের দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার পরিচয়। অবকাশের ভূমিকায় মানুষ সর্বত্রই আপন অমরাবতী-রচনায় ব্যস্ত, সেখানে তার আকাশকুসুমের কুঞ্জবন। এই-সব কাজে সে এত গৌরব বোধ করে যে চাষের খেতে তার অবজ্ঞা। আধুনিক বাংলাভাষায় সে যাকে একটা কুশ্রাব্য নাম দিয়েছে কৃষ্টি, হাল-লাঙলের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই এবং গোরুকে তার বাহন বললে ব্যঙ্গ করা হয়। বলা বাহুল্য, দূরতম তারায় মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন, সেই তারার যে আলোকরশ্মি চার-পাঁচ হাজার এবং ততোধিক বৎসর ধরে ব্যোমবিহারী, গৃহত্যাগী, তারই দৌড় মাপতে মানুষের দিন যায়, তার রাত কাটে। তা ছাড়া মানুষ অকারণে কথার সঙ্গে কথার বিনুনি করে কবিতাও লেখে; এমন-কি, যারা আধপেটা খেয়ে কৃশতনু তারাও বাহবা দেয়। এর থেকেই আন্দাজ করি, মানুষের অন্নের খেত প্রকৃতির এলেকায় থাকতে পারে, দেহের দ্বারে পেয়াদার তাগিদে তার খাজনাও দিতে হয়, কিন্তু যেখানে মানুষের বাস্তুভিটে সেই লাখেরাজ দেবত্রভূমি প্রকৃতির এলেকার বাইরে। সেখানে জোর তলবের দায় নেই, সেখানে সকলের চেয়ে বড়ো দায়িত্ব স্বাধীন দায়িত্ব; তাকে বলব আদর্শের দায়িত্ব,মনুষ্যত্বের দায়িত্ব।

দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন উর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক,আনন্দলাভ হল। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ। বিষয়কে বড়ো করে পায় বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো করে, সত্য করে পায় বলে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।

না বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্র প্রিয়োভবতি। জীবলোকে চৈতন্যের নীহারিকা অস্পষ্ট আলোকে ব্যাপ্ত। সেই নীহারিকা মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে বললে, "অয়মহং ভোঃ! এই-যে আমি।" সেই দিন থেকে মানুষের ইতিহাসে নানা ভাবে নানা রূপে নানা ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলল

'আমি কী'। ঠিক উত্তরটিতে তার আনন্দ, তার গৌরব। জন্তুর উত্তর পাওয়া যায় তার দৈহিক ব্যবস্থার যথাযোগ্যতায়। সনাতন গণ্ডারের মতো স্থূল ব্যবহারে গণ্ডার যদি কোনো বাহ্য বাধা না পায় তা হলে আপন সার্থক্য সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু, মানুষ কী করে হবে মানুষের মতো তাই নিয়ে বর্‌বর-দশা থেকে সভ্য অবস্থা পর্যন্ত তার চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত নেই। সে বুঝেছে, সে সহজ নয়, তার মধ্যে একটা রহস্য আছে; এই রহস্যের আবরণ উদ্‌ঘাটিত হতে হতে তবে সে আপনাকে চিনবে। শত শত শতাব্দী ধরে চলেছে তার প্রয়াস। কত ধর্মতন্ত্র, কত অনুষ্ঠানের পত্তন হল; সহজ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে নিজেকে সে স্বীকার করাতে চায় যে, বাইরে সে যা ভিতরে ভিতরে তার চেয়ে সে বড়ো। এমন কোনো সত্তার স্বরূপকে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে, আদর্শরূপে যিনি তার চেয়ে বড়ো অথচ তার সঙ্গে চিরসম্বন্ধযুক্ত। এমনি করে বড়ো ভূমিকায় নিজের সত্যকে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে তার অহৈতুক আগ্রহ। যাকে সে পূজা করে তার দ্বারাই সে প্রমাণ করে তার মতে নিজে সে সত্য কিসে, তার বুদ্ধি কাকে বলে পূজনীয়, কাকে জানে পূর্ণতা ব'লে। সেইখানেই আপন দেবতার নামে মানুষ উত্তর দিতে চেষ্টা করে " আমি কী — আমার চরম মূল্য কোথায়" । বলা বাহুল্য, উত্তর দেবার উপলক্ষে পূজার বিষয়কল্পনায় অনেক সময়ে তার এমন চিত্ত প্রকাশ পায় বুদ্ধিতে যা অন্ধ, শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস। তাকে বলব ভ্রান্ত উত্তর এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে সকলরকম ভ্রমকেই যেমন শোধন করা দরকার এখানেও তাই। এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই, মানুষের দেবতার শ্রেষ্ঠতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে।

জীবসৃষ্টির প্রকাশপর্যায়ে দেহের দিকটাই যখন প্রধান ছিল তখন দেহসংস্থানঘটিত ভ্রম বা অপূর্ণতা নিয়ে অনেক জীবের ধ্বংস বা অবনতি ঘটেছে। জীবসৃষ্টির প্রকাশে মানুষের মধ্যে যখন 'আমি' এসে দাঁড়ালো তখন এই 'আমি' সম্বন্ধে ভুল করলে দৈহিক বিনাশের চেয়ে বড়ো বিনাশ। এই আমিকে নিয়ে ভুল কোথায় ঘটে সে প্রশ্নের একই উত্তর দিয়েছেন আমাদের সকল মহাপুরুষ। তাঁরা এই অদ্ভুত কথা বলেন, যেখানে আমিকে না-আমির দিকে জানতে বাধা পাই, তাকে অহং-বেড়ায় বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ করে দেখি। এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য; এই সত্যের আদর্শেই বিচার করতে

হবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান, তার রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র — এর থেকে যে পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সেই পরিমাণে সে বর্বর।

মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে। যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল। যে-সব দেশবাসী অতীতকালের তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্মের গতি ছিল আগামীকালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু আবদ্ধ হয় নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করছি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতরূপে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। তাঁদেরই স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান, বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি, তার সৃষ্টি, তার চরিত্র, মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবীকালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিবর্ণনির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন, সব মানুষকে নিয়ে; সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে — যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে। ভবিষ্যৎকাল অসীম, অতীতকালও তাই। এই দুই দিকে মানুষের মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট। পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌। যা ভূত, যা ভাবী, এই-সমস্‌তই সেই পুরুষ। মানুষ ভাবতে ভালোবাসে, কোনো এক কালে তার শ্রেষ্ঠতার আদর্শ পূর্বেই বিষয়ীকৃত। তাই প্রায় সকলজাতীয় মানুষের পুরাণে দেখা যায় সত্যযুগের কল্পনা অতীতকালে। সে মনে করে, যে আদর্শের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ কোনো-এক দূরকালে তা পরিপূর্ণ অখণ্ড বিশুদ্ধ

আকারে। সেই পুরাণের বৃত্তান্তে মানুষের এই আকাঙ্খাটি প্রকাশ পায় যে, অনাদিতে যা প্রতিষ্ঠিত অসীমে তাই প্রমাণিত হতে থাকবে। যে গানটি পূর্বেই সম্পূর্ণ রচিত গাওয়ার দ্বারাই সেটা ক্রমশ প্রকাশমান, এও তেমনি। মনুষ্যত্বের আদর্শ এক কোটিতে সমাপ্ত, আর-এক কোটিতে উপলভ্যমান। এখনকার দিনে মানুষ অতীতকালে সত্যযুগকে মানে না, তবু তার সকলপ্রকার শ্রেয়োনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে অনাগতকালে সত্যযুগের প্রত্যাশা। কোনো ব্যক্তি নাস্তিক হতে পারে কিন্তু সেই নাস্তিক যাকে সত্য ব'লে জানে দূরদেশে ভাবীকালে সেও তাকে সার্থক করবার জন্যে প্রাণ দিতে পারে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অগোচর ভবিষ্যতেই নিজেকে সত্যতররূপে অনুভব করে বলেই তার প্রত্যক্ষ বর্তমানকে বিসর্জন দেওয়া সে ক্ষতি মনে করে না। ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনো আছে অব্যক্ত। তাঁকেই ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণপুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান, কিন্তু তিনি এখনো এসে পৌঁছন নি। বরযাত্রীরা আসছে, যুগের পর যুগ অপেক্ষা করছে, বরের বাজনা আসছে দূর থেকে। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে দূতেরা চলেছে দুর্গম পথে। এই-যে অনিশ্চিত আগামীর দিকে মানুষের এত প্রাণপণ আগ্রহ — এই-যে অনিশ্চিতের মধ্যে, অনাগতের মধ্যে তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত — তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বারবার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারলে না। এই অধ্যবসায়কে বলা যেতে পারত পাগলামি, কিন্তু মানুষ তাকেই বলেছে মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের আশ্রয় কোথায়। অলক্ষ্য একটা পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের মনের আকর্ষণ দেখতে পাই; অন্ধকার ঘরের গাছে, তার শাখায় প্রশাখায়, যেমন একটা স্বাভাবিক ব্যকুলতা প্রাচীরের ও-পারের আলোকের দিকে। আলোক যেমন সত্য, পূর্ণের আকর্ষণ নিয়ত যেখান থেকে প্রেরিত সেও যদি তেমনি সত্য না হত তা হলে জীবিকার প্রয়োজনের বাইরে আত্মার উৎকর্ষের জন্যে মানুষ যা-কিছু চিন্তা করে, কর্ম করে, তার কোনো অর্থই থাকে না। এই সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করি আমাদের সংকল্পে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের আদর্শে। সেই অভাবনীয় পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের দীপ্তিতে,মৃত্যুর গৌরবে। সে আমাদের জ্ঞানকে ঘরছাড়া ক'রে বড়ো ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছে, নইলে পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত। সীমাবদ্ধ সৃষ্টিকে মানুষ প্রত্যক্ষ দেখছে, তাকে ব্যবহার করছে; কিন্তু তার মন বলছে,

এই-সমস্তেরই সত্য রয়েছে সীমার অতীতে — এই সীমাকে যদি প্রশ্ন করি তার শেষ উত্তর পাই নে এই সীমার মধ্যেই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে, ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন, সামগানের মধ্যে যে রহস্য আছে তার প্রতিষ্ঠা কোথায়।

দাল্‌ভ্য বললেন, "এই পৃথিবীতেই।" স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের চরম আশ্রয়, বোধ করি দাল্‌ভ্যের এই ছিল মত।

প্রবাহণ বললেন, "তা হলে তোমার সত্য তো অন্তবান হল, সীমায় এসে ঠেকে গেল যে।" ক্ষতি কী তাতে। ক্ষতি এই যে, সীমার মধ্যে মানুষের জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত থেকে যায়। কোনো সীমাকেই মানুষ চরম বলে যদি মানত তা হলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ করত। একদিন পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, ভৌতিক বিশ্বের মূল উপাদানস্বরূপ আদিভূতগুলিকে তাঁরা একেবারে কোণঠেসা করে ধরেছেন, একটার পর একটা আবরণ খুলে এমন-কিছুতে ঠেকেছেন যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। বললে কী হবে। অন্তরে আছেন প্রবাহণ রাজা, তিনি বহন করে নিয়ে চলেছেন মানুষের সব প্রশ্নকে সীমা থেকে দূরতর ক্ষেত্রে। তিনি বললেন - অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে সাম, অন্তবদ্ বৈ কিল তে সাম।

আদিভূতের যে বস্তুসীমায় প্রশ্ন এসে থেমেছিল সে সীমাও পেরোল। আজ মানুষের চরম ভৌতিক উপলব্ধি পৌঁছল গাণিতিক চিহ্নসংকেতে, কোনো বোধগম্যতায় নয়। একদিন আলোকের তত্ত্বকে মানুষ বোধগম্যতার পরপারেই স্থাপন করেছিল। অদ্ভুত কথা বলেছিল, 'ঈশ্বরের ঢেউ' জিনিসকেই আলোকরূপে অনুভব করি। অথচ ঈশ্বর যে কী আমাদের বোধের ভাষায় তার কোনো কিনারা পাওয়া যায় না। আলো, যা আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল ভৌতিক জিনিসকে প্রকাশ করে দাঁড়ালো তা এমন-কিছুর প্রকাশ যা সম্পূর্ণই ভৌতিক ধর্মের অতীত, কেবল ব্যবহারে মাত্র জানা যায় যে, তাতে নানা ছন্দের ঢেউ খেলে। কিন্তু, প্রবাহণের গণনা থামে না। খবর আসে, কেবল তরঙ্গধর্মী বললে আলোর চরিত্রের হিসাব পুরো মেলে না, সে কণিকাবর্ষীও বটে। এই-সব স্ববিরোধী কথা মানুষের সহজ বুদ্ধির সহজ ভাষার সীমার বাইরেকার কথা। তবু বোধাতীতের ডুবজলেও মানুষ ভয় পেলে না। পাথরের দেয়ালটাকেও বললে বিদ্যুৎকণার নিরন্তর নৃত্য। সন্দেহ করলে

না যে, হয়তো বা পাগল হয়ে গেছি। মনে করলে না, হয়তো প্রজ্ঞা, যাকে বলে রীজ্‌ন্‌, সে মানস-সার্কাসের ডিগ্‌বাজি-খেলোয়ার; সব জিনিসকে একেবারে উলটিয়ে ধরাই তার ব্যাবসা। পশুরা যদি বিচারক হত মানুষকে বলত জন্ম-পাগল। বস্তুত মানুষের বিজ্ঞান সব মানুষকে এক-পাগলামিতে-পাওয়া জীব বলে প্রমাণ করছে। বলছে, সে যাকে যেরকম জানছে বলে মনে করে সেটা একেবারেই তা নয়, সম্পূর্ণই উলটো। জন্তুরা নিজেদের সম্বন্ধে এরকম লাইবেল প্রচার করে না। তাদের বোধের কাছে যেটা যা সেটা তাই, অর্থাৎ তাদের কাছে কেবল আছে তথ্য, তাদের অবিচলিত নিষ্ঠা প্রতীয়মানের প্রতি। তাদের জগতের আয়তন কেবল তলপৃষ্ঠ নিয়ে। তাদের সমস্ত দায় ঐ একতলাটাতেই। মানবজগতের আয়তনে বেধ আছে, যা চোখে পড়ে তার গভীরে। প্রত্যক্ষ তথ্যকে উপেক্ষা করলে মানুষের চলে না। আবার সত্যকেও নইলে নয়।

অন্যান্য বস্তুর মতোই তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো। তাই ঐশ্বর্য-অভিমানী মানুষ বলেছে, ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। বলেছে, অল্পে সুখ নেই, বৃহতেই সুখ।

এটা নিতান্তই বেহিসাবি কথা হল। হিসাববুদ্ধিতে বলে, যা চাই আর যা পাই এই দুটো মাপে মিলে গেলেই সুখের বিষয়। ইংরেজিতে একটা চলতি কথা আছে, যা যথেষ্ট সেটাই ভূরিভোজের সমান-দরের। শাস্ত্রেও বলছে, সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। তবেই তো দেখছি, সন্তোষে সুখ নেই আবার সন্তোষেই সুখ, এই দুটো উলটো কথা সামনে এসে দাঁড়ালো। তার কারণ, মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, যেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু, অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেই দিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত, কেননা তার মধ্যে আছে অমিতমানব। সেই অমিতমানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিতমানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলই মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে। আমাদের ভিতরকার ছোটো মানুষটি তা নিয়ে বিদ্রূপ করে থাকে; বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। উপায় নেই। বিশ্বের মানুষটি ঘরের

মানুষকে পাঠিয়ে দেন বুনো মোষটাকে দাবিয়ে রাখতে, এমন-কি, ঘরের খাওয়া যথেষ্ট না জুটলেও।

উপনিষদে ভগবান সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত। সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত। এই প্রশ্নের উত্তর, স্বে মহিম্নি। নিজের মহিমায়। সেই মহিমাই তাঁর স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত।

মানুষেরও আনন্দ মহিমায়। তাই বলা হয়েছে, ভূমৈব সুখম্। কিন্তু, যে স্বভাবে তার মহিমা সেই স্বভাবকে সে পায় বিরোধের ভিতর দিয়ে, পরম সুখকে পায় পরম দুঃখে। মানুষের সহজ অবস্থা ও স্বভাবের মধ্যে নিত্যই দ্বন্দ্ব। তাই ধর্মের পথকে অর্থাৎ মানুষের পরম স্বভাবের পথকে– দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

জন্তুর অবস্থাও যেমন, স্বভাবও তার অনুগত। তার বরাদ্দও যা কামনাও তার পিছনে চলে বিনা বিদ্রোহে। তার যা পাওনা তার বেশি তার দাবি নেই। মানুষ বলে বসল, "আমি চাই উপরি-পাওনা।" বাঁধা-বরাদ্দের সীমা আছে, উপরি-পাওনার সীমা নেই। মানুষের জীবিকা চলে বাঁধা বরাদ্দে, উপরি-পাওনা দিয়ে প্রকাশ পায় তার মহিমা।

জীবধর্মরক্ষার চেষ্টাতেও মানুষের নিরন্তর একটা দ্বন্দ্ব আছে। সে হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের দ্বন্দ্ব। অপ্রাণ আদিম, অপ্রাণ বিরাট। তার কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হয় প্রাণকে, মালমসলা নিয়ে গড়ে তুলতে হয় দেহযন্ত্র। সেই অপ্রাণ নিষ্ঠুর মহাজনের মতো, ধার দেয় কিন্তু কেবলই টানাটানি করে ফিরে নেবার জন্যে, প্রাণকে দেউলে করে দিয়ে মিলিয়ে দিতে চায় পঞ্চভূতে।

এই প্রাণচেষ্টাতে মানুষের শুধু কেবল অপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব নয়, পরিমিতের সঙ্গে অপরিমিতের। বাঁচবার দিকেও তার উপরি-পাওনার দাবি। বড়ো করে বাঁচতে হবে, তার অন্ন যেমন-তেমন নয়; তার বসন, তার বাসস্থান কেবল কাজ চলবার জন্যে নয় — বড়োকে প্রকাশ করবার জন্যে। এমন-কিছুকে প্রকাশ যাকে সে বলে থাকে "মানুষের প্রকাশ', জীবনযাত্রাতেও যে প্রকাশে ন্যূনতা ঘটলে মানুষ লজ্জিত হয়। সেই তার বাড়তি ভাগের প্রকাশ নিয়ে মানুষের যেমন দুঃসাধ্য প্রয়াস এমন তার সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার

জন্যও নয়। মানুষের মধ্যে যিনি বড়ো আছেন, আহারে বিহারেও পাছে তাঁর অসম্মান হয় মানুষের এই এক বিষম ভাবনা।

ঋজু হয়ে চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই মানুষকে ভারাকর্ষণের বিরুদ্ধে মান বাঁচিয়ে চলতে হয়। পশুর মতো চলতে গেলে তা করতে হত না। মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে চলাতেও তার নিয়ত চেষ্টা,পদে পদেই নীচে পড়বার শঙ্কা। এই মনুষ্যত্ব বাঁচানোর দ্বন্দ্ব মানবধর্মের সঙ্গে পশুধর্মের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের। মানুষের ইতিহাসে এই পশুও আদিম। সে টানছে তামসিকতায়, মূঢ়তার দিকে। পশু বলছে, "সহজধর্মের পথে ভোগ করো।" মানুষ বলছে, "মানবধর্মের দিকে তপস্যা করো।" যাদের মন মন্থর — যারা বলে, যা আছে তাই ভালো, যা হয়ে গেছে তাই শ্রেষ্ঠ, তারা রইল জন্তুধর্মের স্থাবর বেড়াটার মধ্যে; তারা মুক্ত নয়, তারা স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট। তারা পূর্বসঞ্চিত ঐশ্বর্যকে বিকৃত করে, নষ্ট করে।

মানুষ এক দিকে মৃত্যুর অধিকারে, আর-এক দিকে অমৃতে; এক দিকে সে ব্যক্তিগত সীমায়, আর-এক দিকে বিশ্বগত বিরাটে। এই দুয়ের কোনোটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। মানুষ নিজেকে জানে, তদ্‌দূরে তদ্বন্তিকে চ — সে দূরেও বটে, সে নিকটেও। সেই দূরের মানুষের দাবি নিকটের মানুষের সব-কিছুকেই ছাড়িয়ে যায়। এই অপ্রত্যক্ষের দিকে মানুষের কল্পনাবৃত্তি দৌত্য করে। ভুল করে বিস্তর, যেখানে থই পায় না সেখানে অদ্ভুত সৃষ্টি দিয়ে ফাঁক ভরায়; তবুও এই অপ্রতিহত প্রয়াস সত্যকেই প্রমাণ করে, মানুষের এই একটি আশ্চর্য সংস্কারের সাক্ষ্য দেয় যে, যেখানে আজও তার জানা পৌঁছয় নি সেখানেও শেষ হয় নি তার জানা।

গাছে গাছে ঘর্ষণে আগুন জ্বলে। জ্বলে বলেই জ্বলে, এই জেনে চুপ করে থাকলে মানুষের বুদ্ধিকে দোষ দেওয়া যেত না। জানবার নেই বলেই জানা যাচ্ছে না, এ কথাটা সংগত নয় তো কী। কিন্তু, মানুষ ছেলেমানুষের মতো বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ঘর্ষণে আগুন জ্বলে কেন। বুদ্ধির বেগার খাটুনি শুরু হল। খুব সম্ভব গোড়ায় ছেলেমানুষের মতোই জবাব দিয়েছিল; হয়তো বলেছিল, গাছের মধ্যে একটা রাগী ভূত অদৃশ্যভাবে বাস করে, মার খেলে সে রেগে আগুন হয়ে ওঠে। এইরকম সব উত্তরে মানুষের পুরাণ বোঝাই-করা। যাদের শিশুবুদ্ধি কিছুতেই বাড়তে চায় না তারা এইরকম উত্তরকে আঁকড়ে

ধরে থাকে। কিন্তু, অল্পে-সন্তুষ্ট মূঢ়তার মাঝখানেও মানুষের প্রশ্ন বাধা ঠেলে ঠেলে চলে। কাজেই উনুন ধরাবার জন্যে আগুন জ্বালতে মানুষকে যত চেষ্টা করতে হয়েছে তার চেয়ে সে কম চেষ্টা করে নি "আগুন জ্বলে কেন' তার অনাবশ্যক উত্তর বের করতে। এ দিকে হয়তো উনুনের আগুন গেছে নিবে, হাঁড়ি চড়ে নি, পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলছে, প্রশ্ন চলছেই — আগুন জ্বলে কেন। সাক্ষাৎ আগুনের মধ্যে তার উত্তর নেই, উত্তর আছে প্রত্যক্ষ আগুনকে বহুদূরে ছাড়িয়ে। জন্তু-বিচারক মানুষকে কি নির্বোধ বলবে না, আমরা পতঙ্গকে যেমন বলি মূঢ়, বারবার যে পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে?

এই অদ্ভুত বুদ্ধির সকলের চেয়ে স্পর্ধা প্রকাশ পায় যখন মানুষকে সে ঠেলা দিয়ে প্রশ্ন করে, "তুমি আপনি কে।"এমন কথা বলতেও তার বাধে না যে,"মনে হচ্ছে বটে তুমি আছ কিন্তু সত্যই তুমি আছ কি, তুমি আছ কোথায়।" উপস্থিতমত কোনো জবাব না খুঁজে পেয়ে তাড়াতাড়ি যদি বলে বসি "আছি দেহধর্মে" অমনি অন্তর থেকে প্রবাহণ রাজা মাথা নেড়ে বলবেন, ওখানে প্রশ্নের শেষ হতে পারে না। তখন মানুষ বললে, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ — মানবধর্মের গভীর সত্য নিহিত আছে গোপনে। আমার "এই আমি' আছে প্রত্যক্ষে, 'সেই আমি'আছে অপ্রত্যক্ষে।

কথাটা স্পষ্ট করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

এই-যে জল, এই-যে স্থল, এই-যে এটা, এই-যে ওটা, যত-কিছু পদার্থকে নির্দেশ করে বলি 'এই-যে', এ-সমস্তই ভালো করে জেনে-বুঝে নিতে হবে, নইলে ভালো করে বাঁচা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বলে, তদ্‌বিদ্ধি নেদং যদিদম্ উপাসতে। তাকেই জানো। কাকে, না, ইদং অর্থাৎ এই-যে ব'লে যাকে স্বীকার করে তাকে নয়। 'এই-যে আমি শুনছি' এ হল সহজ কথা। তবুও মানুষ বললে, এর শেষ কথা সেইখানে যেখানে ইদং সর্বনাম পৌঁছয় না। খেপার মতো সে জিজ্ঞাসা করে কোথায় আছে শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং– শ্রবণেরও শ্রবণ। ভৌতিক প্রণালীতে খোঁজ করতে করতে এসে ঠেকে বাতাসের কম্পনে। কিন্তু, ওখানেও রয়েছে ইদং, 'এই-যে কম্পন'। কম্পন তো শোনা নয়। যে বলছে 'আমি শুনছি' তার কাছে পৌঁছনো গেল। তারও সত্য কোথায়।

উপর থেকে নীচে পড়ল একটা পাথর। জ্ঞানের দেউড়িতে যে দ্বারী থাকে সে খবর দিলে, এই-যে পড়েছে। নীচের দিকে উপরের বস্তুর যে টান সেইটে ঘটল। দ্বারীর কর্তব্য শেষ

হল। ভিতর-মহল থেকে শোনা গেল, একে টান, ওকে টান, তাকে টান, বারে বারে ‘এই-যে’। কিন্তু সব ‘এই-যে’-কে পেরিয়ে বিশ্বজোড়া একমাত্র টান।

উপনিষদ সকলের মধ্যে এই এককে জানাই বলেন, প্রতিবোধবিদিতম্ — প্রত্যেক পৃথক পড়ার বোধে একটি অদ্বিতীয় টানকে সত্য বলে জানা। তেমনি, আমি শুনি, তুমি শোন, এখন শুনি, তখন শুনি, এই প্রত্যেক শোনার বোধে যে একমাত্র পরম শোনার সত্য বিদিত সেই প্রতিবোধবিদিত এক সত্যই শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং। তার সম্বন্ধে উপনিষদ বলেন, অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। আমরা যা-কিছু জানি এবং জানি নে সব হতেই স্বতন্ত্র। ভৌতিক বিজ্ঞানেও যা গুহাহিত তাকে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কেবল যে মেলাতে পারি নে তা নয়, বলতে হয় — এ তার বিপরীত। ভাষায় বলি ভারাকর্ষণশক্তি, কিন্তু আকর্ষণ বলতে সাধারণত যা বুঝি এ তা নয়, শক্তি বলতে যা বুঝি এ তাও নয়। প্রকৃতির গুহাহিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার করেই মানুষের বাহিরের সমৃদ্ধি; যে সত্যে তার আত্মার সমৃদ্ধি সেও গুহাহিত, তাকে সাধনা করেই পেতে হবে। সেই সাধনাকে মানুষ বলে ধর্মসাধনা।

ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা করে, সাধনা করে স্বভাবকে পাওয়া, কথাটা শোনায় স্ববিরোধী অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে পাওয়া। খ্রীষ্টানশাস্ত্রে মানুষের স্বভাবকে নিন্দা করেছে; বলেছে, তার আদিতেই পাপ, অবাধ্যতা। ভারতীয় শাস্ত্রেও আপনার সত্য পাবার জন্যে স্বভাবকে অস্বীকার করতে বলে। মানুষ নিজে সহজে যা তাকে শ্রদ্ধা করে না। মানুষ বলে বসল, তার সহজ স্বভাবের চেয়ে তার সাধনার স্বভাব সত্য। একটা স্বভাব তার নিজেকে নিয়ে, আর-একটা স্বভাব তার ভূমাকে নিয়ে।

কথিত আছে —

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্‌তৌ সম্পরীত্য বিবিনিক্ত ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥

মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ও আছে, প্রেয়ও আছে। ধীর ব্যক্তি দুইকে পৃথক করেন। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে হীন হন।

এ-সব কথাকে আমার চিরাভ্যস্ত হিতকথা বলে গণ্য করি অর্থাৎ মনে করি, লোক-ব্যবহারের উপদেশরূপেই এর মূল্য। কিন্তু, সমাজব্যবহারের প্রতি লক্ষ করেই এ শ্লোকটি বলা হয় নি। এই শ্লোকে আত্মাকে সত্য করে জানবার উপায় আলোচনা করা হয়েছে। প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমার যা ইচ্ছা করি সেই প্রেয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে বর্তমান, আবার যা ইচ্ছা করা উচিত সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবে। শ্রেয়কে গ্রহণ করার দ্বারা মানুষ কিছু-একটা পায় যে তা নয়, কিছু-একটা হয়। সেই হওয়াকে বলে সাধু হওয়া। তার দ্বারা ধনী হয় না, বলী হয় না, সমাজে সম্মানিত হতেও পারে, না হতেও পারে, এমন-কি অবমানিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সাধু হওয়া পদার্থটা কী, প্রকৃতির রাজ্যে তার কোনো কিনারা নেই। শ্রেয় শব্দটাও তেমনি। অপর পক্ষে প্রেয়কে একান্তরূপে বরণ করার দ্বারা মানুষ আর-একটা কিছু হয়, তাকে উপনিষদ বলেছেন — আপন অর্থ থেকে হীন হওয়া। নাগর শব্দ বলতে যদি citizen না বুঝিয়ে libertine বুঝায় তা হলে বলতে হয়, নাগর শব্দ আপন সত্য অর্থ হতে হীন হয়ে গেছে। তেমনি একান্তভাবে প্রেয়কে অবলম্বন করলে, মানুষ বলতে যা বোঝায় সেই সত্য হীন হয়ে যায়। নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া। প্রাকৃতিক স্বভাবের উপরেও মানুষের আত্মিক স্বভাব যদি না থাকত তা হলে এ-সব কথার অর্থ থাকত না।

ডিমের মধ্যেই পাখির প্রথম জন্ম। তখনকার মতো সেই ডিমটাই তার একমাত্র ইদম্। আর-কিছুই সে জানে না। তবু তার মধ্যে একটা প্রবর্তনা আছে বাইরের অজানার মধ্যে সার্থকতার দিকে। সেই সার্থকতা — নেদং যদিদমুপাসতে। যদি খোলাটার মধ্যেই এক-শো বছর সে বেঁচে থাকত তা হলে সেটাকেই বলা যেত তার মহতী বিনষ্টি।

মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জড়প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবেই বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা। অহংকারকে ভোগাশক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি।

জ্যোতির্বিদ দেখলেন, কোনো গ্রহ আপন কক্ষপথ থেকে বিচলিত। নিঃসন্দেহ-মনে বললেন, অন্য কোনো অগোচর গ্রহের অদৃশ্য শক্তি তাকে টান দিয়েছে! দেখা গেল, মানুষেরও মন আপন প্রকৃতিনির্দিষ্ট প্রাণধারণের কক্ষপথ যথাযথ আবৃত্তি করে চলছে না। অনির্দিষ্টের দিকে, স্বভাবের অতীতের দিকে ঝুঁকছে। তার থেকে মানুষ কল্পনা করলে দেবলোক। বললে, আদেশ সেইখানকার, আকর্ষণ সেখান হতে। কে সেই দেবলোকের দেবতা তা নিয়ে মানুষে মানুষে হানাহানি চলেছে। যিনিই হোন, তাঁকে দেবতাই বলি আর যাই বলি, মানুষকে জীবসীমার মধ্যে কিছুতেই স্থির থাকতে দিলেন না। সমুদ্র চঞ্চল হল। জোয়ার-ভাঁটার ওঠাপড়া চলছেই। চাঁদ না দেখা গেলেও সমুদ্রের চাঞ্চল্যেই চাঁদের আহ্বান প্রমাণ হত। বাঁচবার চেষ্টাতেও মানুষ অনেক সময় মরে। যে ক্ষুধা তার অন্তরে নিঃসংশয়, তার লক্ষ্য যে তার বাইরেও সত্য সে কথাটা সদ্যোজাত শিশুও স্বতই জানে। মানুষের প্রাণান্তিক উদ্যম দেখা গেছে এমন কিছুর জন্যে যার সঙ্গে বাঁচবার প্রয়োজনের কোনো যোগই নেই। মৃত্যুকে ছাড়িয়ে আছে যে প্রাণ সেই তাকে দুঃসাহসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ভৌতিক প্রাণের পথে প্রাণীর নিজেকে রক্ষা; আর এ পথে আত্মবানের আত্মাকে রক্ষা নয়, আত্মাকে প্রকাশ।

বৈদিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলেছে আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর সম্বন্ধে বলেছে, যস্য নাম মহদ্ যশঃ। তাঁর মহদ্‌যশই তাঁর নাম, তাঁর মহৎ কীর্তিতেই তিনি সত্য। মানুষের স্বভাবও তাই — আত্মাকে প্রকাশ। বাইরে থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার দ্বারাই প্রাণী আপনাকে রক্ষা করে, বাইরে আপনাকে উৎসর্গ করার দ্বারাই আত্মা আপনাকে প্রকাশ করে। এইখানে প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে সে আপনাকে ঘোষণা করে। এমন-কি, বর্বর দেশের মানুষও নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টায় প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে চায়। সে নাক ফুঁড়ে মস্ত এক শলা দিয়েছে চালিয়ে। উখো দিয়ে দাঁত ঘষে ঘষে ছুঁচোলো করেছে। শিশুকালে তক্তা দিয়ে চেপে বিকৃত করেছে মাথার খুলি, বানিয়েছে বিকটাকার বেশভূষা। এই-সব উৎকট সাজে-সজ্জায় অসহ্য কষ্ট মেনেছে; বলতে চেয়েছে, সে নিজে সহজে যা তার চেয়ে সে বড়ো। সেই তার বড়ো-আমি প্রকৃতির বিপরীত। যে দেবতাকে সে আপন আদর্শ বলে মানে সেও এমনি অদ্ভুত; তার মহিমার প্রধান পরিচয় এই যে, সে অপ্রাকৃতিক। প্রকৃতির হাতে পালিত তবু প্রকৃতিকে দুয়ো দেবার জন্যে মানুষের এই যেন একটা ঝগড়াটে ভাব।

ভারতবর্ষেও দেখি, কত লোক, কেউ বা উর্ধ্ববাহু, কেউ বা কণ্টকশয্যায় শয়ান, কেউ বা অগ্নিকুণ্ডের দিকে নতশীর্ষ। তারা জানাচ্ছে, তারা শ্রেষ্ঠ, তারা সাধু, কেননা তারা অস্বাভাবিক। আধুনিক পাশ্চাত্য দেশেও কত লোক নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধনের গৌরব করে। তাকে বলে "রেকর্ড ব্রেক' করা, দুঃসাধ্যতার পূর্ব-অধ্যবসায় পার হওয়া। সাঁতার কাটছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বাইসিক্‌লে অবিশ্রাম ঘুরপাক খাচ্ছে, দীর্ঘ উপবাস করছে স্বর্ধা করে, কেবলমাত্র অস্বাভাবিকতার গৌরব প্রচারের জন্যে। ময়ূরকে দেখা যায় গর্ব করতে আপন ময়ূরত্ব নিয়েই, হিংস্র জন্তু উৎসাহ বোধ করে আপনার হিংস্রতার সাফল্যে। কিন্তু, বর্বর মানুষ মুখশ্রীর বিকৃতি ও বেশভূষার অতিকৃতি নিয়ে গর্ব করে জানায়, "আমি ঠিক মানুষের মতো নই, সাধারণ মানুষরূপে আমাকে চেনবার জো নেই।" এমনতরো আত্মপ্রকাশের চেষ্টাকে বলি নঙর্থক, এ সদর্থক নয়; প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্পর্ধামাত্র, যা তার সহজ তার প্রতিবাদমাত্র — তার বেশি আর কোনো অর্থ এতে নেই। অহংকারের প্রকাশকে আত্মগৌরবের প্রকাশ ব'লে মনে করা বর্বরতা, যেমন নিরর্থক বাহ্যানুষ্ঠানকে মনে করা পুণ্যানুষ্ঠান।

এ যেমন দৈহিক দিকে তেমনি আর্থিক দিকেও মানুষের স্পর্ধার অন্ত নেই। এখানেও রেকড্ ব্রেক করা, পূর্ব-ইতিহাসের বেড়া-ডিঙোনো লম্ফ। এখানকার চেষ্টা ঠিক অস্বাভাবিকের জন্যে নয়, অসাধারণের জন্যে। এতে আছে সীমার প্রতি অসহিষ্ণুতা তার বাইরে আর কিছুই নয়। কিন্তু, যা-কিছু বস্তুগত যা বাহ্যিক, সীমাই তার ধর্ম। সেই সীমাকে বাড়িয়ে চলা যায়, পেরিয়ে যাওয়া যায় না। যিশুখ্রীষ্ট বলেছেন, সূচীর রন্ধ্র দিয়ে উট যেমন গলে না ধনীর পক্ষে স্বর্গদ্বার তেমনি দুর্গম। কেননা ধনী নিজের সত্যকে এমন-কিছুর দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করতে অভ্যস্ত যা অপরিমেয়ের বিপরীত, তাই সে হীয়তেহর্থাৎ, মনুষ্যত্বের অর্থ হতে হীন হয়। হাতির মতো বড়ো হওয়াকে মানুষ বড়োলোক হওয়া বলে না, হয়তো বর্বর মানুষ তাও চলে। বাহিরের উপকরণ পুঞ্জিত করার গর্ব করা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। অন্যের চেয়ে আমার বস্তুসঞ্চয় বেশি, এ কথা মানুষের পক্ষে বলবার নয়। তাই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম। তিনি উপেক্ষা করেছিলেন উপকরণবতাং জীবিতম্। যে ওস্তাদ তানের অজস্রতা গণনা ক'রে গানের শ্রেষ্ঠতা বিচার করে তার বিদ্যাকে সেই উটের সঙ্গে তুলনা করব। শ্রেষ্ঠ গান এমন

পর্যাপ্তিতে এসে স্তব্ধ হয় যার উপরে আর একটিমাত্র সুরও যোগ করা যায় না। বস্তুত গানের সেই থামাকে সীমা বলা যায় না। সে এমন একটি শেষ যার শেষ নেই। অতএব যথার্থ গায়কের আত্মা আপন সার্থকতাকে প্রকাশ করে তানের প্রভূত সংখ্যার দ্বারা নয়, সমগ্র গানের সেই চরম রূপের দ্বারা, যা অপরিমেয়, অনির্বচনীয়, বাইরের দৃষ্টিতে যা স্বল্প, অন্তরে যা অসীম। তাই মানুষের যে সংসার তার অহং-এর ক্ষেত্র সে দিকে তার অহংকার ভূরিতায়, যে দিকে তার আত্মা সে দিকে তার সার্থকতা ভূমায়। এক দিকে তার গর্ব স্বার্থসিদ্ধিতে, আর-এক দিকে তার গৌরব পরিপূর্ণতায়। সৌন্দর্য কল্যাণ বীর্য ত্যাগ প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকে, অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে, উপলব্ধি করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে। যং লব্ধ্বাচাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

চারি দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য-সকল প্রাণী, বাইরে থেকে জীবিকার অর্থ খুঁজে খুঁজে। মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে কাকে অনুভব করলে। যিনি নিহিতার্থো দধাতি, যিনি তাকে আর অন্তর্নিহিত অর্থ দিচ্ছেন। সেই অর্থ মানুষের আপন আত্মারই গভীর অর্থ। সেই অর্থ এই যে মানুষ মহৎ। মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে মহৎ; তবেই প্রমাণ হবে যে, সে মানুষ। প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ করতে হবে; কেননা তিনি চিরন্তন মানব, সর্বজনীন মানব, তিনি মৃত্যুর অতীত– তাঁকে যে অর্ঘ্য দিতে হবে সে অর্ঘ্য সকল মানুষের হয়ে, সকল কালের হয়ে, আপনারই অন্তরতম বেদীতে। আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই — অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যত-কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ যত কান্না। সেই বাইরে-বিক্ষিপ্ত আপনাহারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে–

আমি কোথায় পাব তারে

আমার মনের মানুষ যে রে।

হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে

দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম — তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল — মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে, আবিরাবীর্ম এধি — পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।

১৪.৪। 'মানুষের ধর্ম-১' প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়

মানুষের মধ্যে দুটো ভাব আছে - একটা তার জীবস্বভাব, আর একটা তার বিশ্বস্বভাব। মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এই আদর্শ একটা আন্তরিক আহান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব। অভিব্যক্তির ধারায় জীব থেকে জন্মেছে মানুষ। দেহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে মন ও বুদ্ধির। ব্যক্তি নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইল না, সে চেয়েছে প্রসার। সেই থেকে চলেছে মানবচিন্তের প্রসার বিশ্বমানবমনের দিকে। সেখানেই তার মুক্তি। জীবস্বভাবে মানুষ স্বার্থপর, নিজের প্রয়োজনটাকেই বড়ো করে দেখে আবার বিশ্বস্বভাবে মানুষ প্রয়োজনের গন্ডীকে অতিক্রম করে যায় বৃহতের প্রতি আত্মসমর্পণ করে। মানুষের মন, বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি যখন থেকে জীবনযাপনের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকল না, তখনই সে মনুষ্যত্বের মহৎ অধিকার লাভ করলো। কাব্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে শিল্পে প্রকাশ পেল মানুষের মনুষ্যত্বের মহিমা। এতে মানুষের যে আনন্দ তা সাধারণ আনন্দ নয়, তা গভীর। কিন্তু এই আনন্দের

অধিকার মানুষ সহজে লাভ করেনি, অনেক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে, অনেক সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ তা লাভ করেছে। মানুষ যথার্থভাবে যা চায় তা ভূমা - সে ভূমাকে চায় -

ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। কিন্তু যেমন-তেমন করে ভূমাকে লাভ করা যায় না। তাতে অনেক দুঃখ, অনেক বিপদ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। আসলে মানুষের স্বভাবে প্রেয়ও আছে, শ্রেয়ও আছে। জ্ঞানী ব্যক্তি দুইকে পৃথক করেন। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি প্রাজ্ঞ, যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে বঞ্চিত হন। মানুষ জীবস্বভাব নিয়ে জীবরূপে জন্মেছে, তখন শ্রেয়ই তার অভিলষিত; কিন্তু শ্রেয়ের পথে যাবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়েছে, তাকে মানুষের আসল স্বভাব প্রকাশিত হয়েছে।

সকল দিক থেকেই দেখা যায় মানুষের গতি অন্য সকল প্রাণী থেকে ভিন্ন। মানুষ অন্তরের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে অনুভব করে ভূমাকে, তার নিজের আত্মাকে। এই আত্মা যেমন ব্যক্তির পক্ষে সত্য, তেমনি সমগ্র মানুষের পক্ষে সত্য বিশ্বমানবাত্মা - সর্বজনীন মানব। এই মানবের অনুসন্ধান তার অন্তরে, বাইরের জগতে নয়। বাউলদের কথায় ইনি 'মনের মানুষ'।

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষ তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

১৪.৫। 'মানুষের ধর্ম-১' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা

মানুষের ধর্ম গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিকে রবীন্দ্রনাথ 'দর্শনের কোঠায়' ফেলতে চাননি; বলেছেন - "এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা।" নিজের সম্বন্ধে এরকম কথা বলা হলেও 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে নান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, পূবপ্রতিঠিত দার্শনিক তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন তুলনামূলকভাবে ব্যখ্যা বিশ্লেষণও করেছেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনও চেয়েছেন। এই পদ্ধতি দার্শনিক-এর। আর দর্শনের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণাগুলি এই গ্রন্থ

থেকে পাওয়া যায় তাহলো বিশ্বমানবসত্তার উপস্থাপনা, শ্রেয়বোধের সত্যতা, অহং এবং আত্মার দ্বন্দ্ব, অভিব্যক্তিবাদতত্ত্ব, সোহহং তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা, দুঃখ-বিপদ ও সংগ্রামের জীবনকে বরণ করার মূল্য, মানবব্রহ্মের কল্পনা ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে, এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতিও অভিনব।

মজার কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথকে কবি-দার্শনিক অনেকেই বলেছেন, কিন্তু দার্শনিক হিসেবে এদের মধ্যে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে চাননি। তবে কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিকও, তা প্রমাণিত হয়েছে, ড. সর্বপল্লীরাধাকৃষ্ণণ, ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ড. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অমিয় রতন মুখোপাধ্যায়, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, প্রমুখ বিখ্যাত লেখকবৃন্দের রচনায়। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কিনা এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটিও প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - "আমি দার্শনিক বই প্রায় পড়ি নাই - ভয় হয় পাছে যাহাকে সহজ বলিয়া জানি তাহার কঠিন স্বরূপ দেখিয়া আতঙ্ক জন্মে। সমস্ত প্রকৃতি দিয়া যাহাকে অনুভব করা যায় তাহাকে কেবল মাথা দিয়া দেখিতে গেলে অনেকটা অংশ হাঁ হাঁ করে - তাহার সকল স্থানে সমান আলোকপাত হয় না - ধর্ম, ধর্মনীতির মূলে যে বিশ্বব্যাপী স্বয়ম্ভু আনন্দ আছে তাহাকে প্রমাণের মধ্যে কেমন করিয়া আনা যায় এবং তাহাকে বাদ দিয়া ধর্মকে দেখিতে গেলে শাস্ত্রবিরোধের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। ফিলজফির সিস্টেমগুলি দেখিলে আমার ভয় হয়।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের এই কথাগুলি- 'তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব।' 'কবি তো বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতিবিদ্ নহে। কবিত্ব মানুষের প্রথম বিকাশের লাবণ্যপ্রভাত।' 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের চতুর্থ রচনায় রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন – "একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" সুতরাং তিনি দার্শনিক নন, একথা নিজেই বলেছেন।

তবুও রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক। কেননা যথার্থ দার্শানকের মতই তিনি সত্যের অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, উপলব্ধির মহিমায় তাঁর অন্বেষণ পরিণত। একথা ঠিক যে, দার্শনিকদের মতো তিনি তাঁর জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত নিজস্ব চিন্তাপ্রবাহকে সুসংহত যুক্তিমাধ্যমে দার্শনিক

তত্ত্ব রূপায়িত করেননি, কিন্তু জীবনরহস্যের কেন্দ্র, বিশ্বরহস্যের কেন্দ্রে তিনি তাঁর ভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন, সত্তার স্বরূপ উদঘাটনে আমৃত্যু সৃষ্টিশীল মনের ব্যাকুলতাকে দার্শনিকতায় মহিমান্বিত করেছেন। তাঁর মহাজীবনের অন্ত্যপর্বের কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। হয়তো দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিকে দর্শনশাস্ত্রসম্মত কোনো তত্ত্বপরিকল্পনার পর্যায়ভূক্ত করা যাবে না, কিন্তু তিনি তাঁর বিপুল বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে রেখে গিয়েছেন বিশ্ববীক্ষা এবং দার্শনিকের সংহত উপলব্ধি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের : 'Sadhana' (১৯১৩), 'Personality' (১৯১৭), 'Creative Unity' (১৯২২), 'The Religion of Man' (১৯৩১), 'ধর্ম' (১৯০৯) 'শান্তিনিকেতন' (১৯০৯-১০), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) এবং 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থ থেকে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাই। তার মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'শেষলেখা' (১৯৪১) কাব্য থেকে কয়েকটি কবিতার দৃষ্টান্ত রাখা হচ্ছে, যেখানে কবি এবং দাশনিক সংহত হয়েছেন যেখান কবির উচ্চারণ দাশনিক-চিন্তার দীপ্তিতে ভাস্বর।

রবীন্দ্রনাথের দাশনিক দৃষ্টি মানবকেন্দ্রিক। মানবসত্তায় অনুসৃত সত্যকে অবলম্বন করেই তাঁর দাশনিক প্রতীতি ব্যক্ত হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে পরিপূর্ণ 'চৈতন্যের জ্যোতি'। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চিন্তার ভাণ্ডার থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক নিয়েছেন, তবে শেষপর্যন্ত তাঁর দর্শন-চিন্তা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। "কোথাও তার মিল খুঁজে পাবো উপনিষদীয় আত্মজিজ্ঞাসায় - কোথাও বা বৌদ্ধ আত্মনির্ভরতায়। কোথাও বা তা ধরা দেবে বৈষ্ণবীয় দ্বৈত লীলায় - কোথাও বা তা বাউলের আপনার 'অন্তরতম আমি' - কে চেনার সাধনায়। কোথাও বা তার রূপ প্রকাশিত হবে সাধারণ মানুষের ছোটো-খাটো সুখ, দুঃখ, প্রীতি-ভালোবাসার অমৃত অনুভূতিতে - কোথাও বা তা প্রতিফলিত হবে চিরকালীন মানব বা মহামানবের জ্ঞান, কর্ম এবং প্রীতির আদর্শের অনুপ্রেরণায়।" (রবীন্দ্রচেতনায় 'মানবধর্ম' - ড. তুষারকণা রায়) রবীন্দ্রনাথের দর্শন-চিন্তা আলোচনাসূত্রে পাশ্চাত্যের দর্শন বিশেষত ডারউইনের 'অভিব্যক্তিবাদ', বের্গসঁর প্রাণবাদী দর্শনতত্ত্ব 'Creative Evolution' জার্মান দার্শনিক হেগেল এবং তাঁর অনুগামী ইংরাজ দার্শনিক ব্রাডলীর চৈতন্যবাদী দর্শনের সাদৃশ্যের বিষয়টি উচ্চারিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশিষ্ট দার্শনিক ড: হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "রবীন্দ্র-দর্শনের একেবারে গোড়ার কথা হল তার অনুভূতিমার্গের প্রতি পক্ষপাত। যুক্তিমার্গকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেন না; তবে তাঁর ধারণায় তা বিশ্বসততার নিবিড় পরিচয় এনে দিতে পারে না। তিনি বলেন বিশ্বের মধ্যে দুটি ব্যাপার চলেছে। একটি হল কাজের ব্যাপার। তা বিশ্বকে পরিচালিত করে রাখে। সেখানে প্রকৃতির রাজত্ব। এখানে যুক্তিমার্গের প্রয়োগের ক্ষেত্র আছে; কারণ এখানে হৃদয়ের আদান-প্রদানের অবকাশ নাই। কিন্তু বিশসত্তার আর একটি প্রকাশ আছে যাকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসত্তার আনন্দের প্রকাশ বলেছেন। সেখানে তিনি ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট এবং ব্যক্তি-মানুষের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী। সেখানে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের অবকাশ নাই। সেখানে তাঁকে পেতে হবে হৃদয় বৃত্তির সাহায্যে। কারণ সেখানে শুধু জানা নয়, তাঁকে পেতে হবে। অনুভূতিমার্গই সেখানে একমাত্র প্রশস্ত মার্গ।" (রবীন্দ্র দর্শন)

অনুভূতিমার্গেই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন বিশ্বসত্তার, বিশ্বদেবতার, জীবনদেবতার তত্ত্ব, বিশ্বমানবতত্ত্ব ইত্যাদি। অনুভূতিমার্গেই তিনি পেয়েছেন মুক্তিতত্ত্ব, আনন্দতত্ত্ব। তাঁর ধারণায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব অলীক নয়, এরই মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন, বিশ্বের মধ্যে বিশ্বদেবতার উপস্থিতি উপলব্ধি করে, বিশ্ববাসীর প্রতি প্রীতি বহন করে, বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগ করলেই মুক্তির আনন্দ পাওয়া যায়। তাঁর মুক্তিভাবনার একটি বিশেষ কবিতা -

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়।
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দিরমাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার

রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,

প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

১৪.৬। মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

'মানুষের ধর্ম'বইতে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভিতর দুরকম ধর্মের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। প্রথমটি নিতান্ত প্রাকৃতিক তথা জৈব ধর্ম, যে-ধর্মে শারীরিক প্রয়োজনই সব। মানুষের পূর্বপুরুষ অতীতকালে চার হাত-পায়ে চলাফেরা করেছে। উবু হয়ে চলবার কালে তাদের দৃষ্টি কেবল নিচের দিকেই নিবদ্ধ থেকেছে। তার পরে এক সময়ে মানুষ যখন চলাফেরার কাজ থেকে হাত দুটো মুক্ত করে উঠে দাঁড়াতে পেরেছে, তখন তার দৃষ্টিসীমা গেছে বেড়ে। দূরকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। আর মুক্ত হাত দুটিকে অন্য নানা কাজে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়েছে। শারীরিক প্রয়োজন ছাড়ানো নানা সূক্ষ্ম কাজে হাতের ব্যবহার শুরু হয়েছে এইভাবে। আদিগন্ত প্রসারিত দৃশ্য আর বিনা প্রয়োজনের কাজ মানুষকে সৌন্দর্যবোধে দীক্ষা দিয়েছিল। জীবসত্তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে মানসধর্মের জাগরণ হওয়ার ফলে প্রাণীজগতের স্বভাবধর্ম থেকে মানুষের ধর্মে উত্তরণ ঘটে মানবজাতির। এই তার দ্বিতীয় ধর্ম।

মানুষকে রবীন্দ্রনাথ চিরযাত্রী বলেছেন। মনুষ্যত্বের সারসত্তার দিকে তার নিয়ত অভিযাত্রা। যে-যাত্রার কথা রয়েছে এলিয়টের 'দি জার্নি অব দি ম্যাজাই' কবিতায়। পূর্বদেশীয় বৃদ্ধরা দীর্ঘ যাত্রার অন্তে তীর্থে পৌঁছে বলেছিল, 'মাতা দ্বার খোলো'। শিশু যিশুখ্রিষ্টের মতো মহামানব তথা শাশ্বত মানবের আবির্ভাব ঘটে তখন। 'শিশুতীর্থে'র যাত্রীরাও ভয়াবহ ওঠাপড়া বাদবিসংবাদের ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ওই চিরমানবতার তীর্থে উপনীত হয়েছিল। 'সভ্যতার সংকটে'র যন্ত্রণাদীর্ণ কবিও শেষ পর্যন্ত গেয়ে উঠেছেন—'ওই মহামানব আসে।/দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে/মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে'। চিরন্তন মানুষ হওয়ার জন্যই যাত্রা সর্বমানবের। দেশে দেশে কালে কালে মানুষ তার সাধনা দিয়ে এক

অখণ্ড মানবসত্তা গড়ে তোলে। সেই সত্তা তাকে আপন আত্মা অর্থাৎ আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। সকল মানুষের মিলিত সাধনাতেই অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পাই আমরা। তা থেকে মানবমূল্যবোধ তৈরি হয়ে সভ্যতার ভিত্তি পত্তন করে।

রবীন্দ্রনাথ তুলনা করে দেখিয়েছেন—মানবদেহে যেমন অসংখ্য জীবকোষের অবস্থান এবং সেগুলি স্বতন্ত্র থেকেও দেহের সার্বিক পরিপোষণে নিয়োজিত থাকে, তেমনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানুষই সমন্বিতভাবে মানবসত্তা গড়ে তোলে। সেই পূর্ণের অনুভব ব্যক্তি মানুষের উপলব্ধিতে থাকে। তাই মানুষ জানতে পারে সে ব্যক্তিমাত্র নয়, বিশ্বমানবের অন্তর্গত সত্তা। এতে জাগতিক কোনো সুবিধা নেই, কিন্তু বিরাট সত্তার সঙ্গে একাত্মতার বোধ থেকে জন্মায় অহেতুক আনন্দ। এ সবই মনুষ্যত্বধর্মের পরিচয় বহন করে।

শিল্পসাধনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আর কর্মের সাধনা মানুষের জগৎকে ক্রমপ্রসারিত করে। সকল সাধনার ফসল মানবসম্পদ হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করে। বর্তমানের মানুষ যেমন পূর্বপুরুষের মানসসম্পদের উত্তরাধিকারী হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিসত্তাকে অহং আর ব্যক্তির ভিতরের অর্থাৎ অন্তর্গত সত্তাকে বলেছেন আত্মা। তুলনা দিয়েছেন, ব্যক্তিসত্তাকে যদি বলি প্রদীপ, তো আত্মা হচ্ছে তার শিখা। অন্তর্গত সত্তার কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায়-গানে ফিরে ফিরে এসেছে। গানের দৃষ্টান্ত দিই, যেখানে অন্তর্বাসী সত্তাকে জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কবি—

‘মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-’পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।।’

অন্তর-সম্পদই মানুষকে মহৎ করে। আর অন্ধ ধর্মাচরণে ব্যক্তি হয়ে পড়ে অহংপ্রবণ, যেমন আমরা দেখেছি কাব্যনাট্য ‘বিসর্জনে’ রঘুপতির আচরণে। অপরপক্ষে জয়সিংহ মানবিক বিশ্বাসে স্থির থেকে প্রাণ দিয়ে প্রেমের ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে। তখন রক্তপায়ী দেবী মূর্তিকে পরিহার করে মহৎ মানব-আত্মাকেই পুষ্পার্ঘ্য দেন কবি। ঘোষণা করেন, প্রেমধর্ম দীক্ষিত মানুষই আকাঙ্ক্ষিত মনুষ্যত্বের ধারক।

‘পত্রপূট’ কাব্যের পনেরো নম্বর কবিতাতে মানবধর্মে বিশ্বাসী পরিণতবয়সী রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তুলে ধরছি।—‘শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,/পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা

শাস্ত্রে,/কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।/তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে/পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।/আজ দেখেছি প্রমাণ হয়নি আমার জীবনে।/...মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা/বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে-/সকল বেড়ার বাইরে,/নক্ষত্রখচিত আকাশতলে,/পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,/...'। তারপর শেষ কথা—'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন/সকল মন্দিরের বাহিরে/আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল/দেবলোক থেকে মানবলোকে/আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে/আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।' প্রবন্ধের চেয়ে সাহিত্যে মানুষের ধর্মে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের ছাপ গভীরতর। 'শিশুতীর্থ' কবিতাতেও মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা রয়েছে। কষ্টসাধ্য দীর্ঘ মানবযাত্রায় অসহিষ্ণু মানুষ ক্রোধবশে বিশ্বাসী তীর্থযাত্রীকে হনন করে বসে। মানবতাবোধে অবিশ্বাসী হয়ে চীৎকার করে 'পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি'। সকাল বেলার আলোতে নিজেদের কীর্তি দেখতে পেয়ে শিউরে ওঠে নিজেরাই। ধর্মপ্রাণ পথপ্রদর্শকের দেখানো পথেই যাত্রা করে আবার। মহামানবের জন্মতীর্থে পৌঁছে ধ্বনি দেয়-'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের'।

সমসাময়িক কালের যাত্রায় আজ আমরাও পৌঁছেছি অসহিষ্ণু হানাহানির পরিস্থিতিতে। হত্যা এখন তুচ্ছ বিষয়। তথাকথিত ধর্মের নামে হত্যা, স্বার্থ উদ্ধারে হত্যা, এমনকী অকারণ আনন্দের জন্যেও হত্যা! জৈব প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে প্রধান। পশুশক্তিই হয়েছে আদ্যাশক্তি! মানুষের ধর্মের সঙ্গে এই পরিস্থিতি সাংঘর্ষিক। আচারসর্বস্ব ধর্মতন্ত্র প্রবল হয়ে ধর্মকে কোণঠাসা করে ফেলছে ক্রমে। 'কালান্তর' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম আর ধর্মতন্ত্রের বৈপরীত্য নির্দেশ করেছেন বিস্তৃত ভাষ্যে। তার সামান্য অংশ উদ্ধার করি—'ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে।...ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার।'

ধর্মতন্ত্রীরা প্রবল হয়ে উঠে ধর্মকে দলিত করছে আজ। হিংসার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশ্বের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তারা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছে। সমগ্র বিশ্ব আজ

সংকট-জর্জরিত। মানুষকে আজ মানসসম্পদে ঋদ্ধ হতে হবে। বাংলার কি-নাগরিক কি-লোকসাহিত্যে মহৎপ্রাণ কবিরা যে সব কথা বলে গেছেন, আজ তা স্মরণ করতে হবে। আস্থা রাখতে হবে তার ওপর। 'সবার উপরে মানুষ সত্য। তাহার উপরে নাই'—চণ্ডীদাসের এই বাণী থেকে শক্তি সঞ্চয় করা জরুরি। লালন-ও গেয়েছেন—'সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার, মানুষগুরু নিষ্ঠা যার'। নজরুল আবার ধর্মের চেয়েও বড়ো করে দেখেছেন মানুষকে, বলেছেন—'মানুষ এনেছে ধর্ম, ধর্ম আনেনি মানুষ কোনো।

অধর্মাচারী হিংসার কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য মানুষকে আজ সত্যধর্ম আর যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার ঘটাতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের অস্ত্র।

১৪.৭। অন্তর বাহির: মূল প্রবন্ধ পাঠ

অন্তর বাহির

ভোরে ক্যাবিনে বিছানায় যখন প্রথম ঘুম ভাঙিয়া গেল– গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলাম, সমুদ্রে আজ ঢেউ দিয়াছে; পশ্চিম দিক হইতে বেগে বাতাস বহিতেছে। কান পাতিয়া তরঙ্গের কলশব্দ শুনিতে শুনিতে এক সময় মনে হইল, কোন্-একটা অদৃশ্যযন্ত্রে গান বাজিয়া উঠিতেছে। সে গানের শব্দ যে মেঘগর্জনের মতো প্রবল তাহা নহে, তাহা গভীর এবং বিলম্বিত; কিন্তু, যেমন মৃদঙ্গ-করতালের বলবান শব্দের ঘটার মধ্যে বেহালার একটি তারের একটানা তান সকলকে ছাপাইয়া বুকের ভিতরে বাজিতে থাকে, তেমনি সেই ধীর গম্ভীর সুরের অবিরাম ধারা সমস্ত আকাশের মর্মস্থলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল। শেষকালে এমন হইল, আমার মনের মধ্যে যে সুর শুনিতেছিলাম তাহাই কণ্ঠে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু, এরূপ চেষ্টা একটা দৌরাত্ম্য; ইহাতে সেই বড়ো সুরটির শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়; তাই আমি চুপ করিলাম।

একটা কথা আমার মনে হইল, প্রভাতে মহাসমুদ্র আমার মনের যন্ত্রে এই-যে গান জাগাইল তাহা তো বাতাসের গর্জন ও তরঙ্গের কলধ্বনির প্রতিধ্বনি নহে। তাহাকে কিছুতেই এই আকাশব্যাপী জলবাতাসের শব্দের অনুকরণ বলিতে পারি না। তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহা একটি গান; তাহাতে সুরগুলি ফুলের পাপড়ির মতো একটির পরের আর-একটি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত হইতেছিল। অথচ আমার মনে হইতেছিল, তাহা

স্বতন্ত্র কিছুই নহে, তাহা এই সমুদ্রের বিপুল শব্দোচ্ছ্বাসেরই অন্তরতর ধ্বনি; এই গানই পূজামন্দিরের সুগন্ধি ধূপের ধুমের মতো আকাশকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ণ করিয়া কেবলই উপরে উঠিতেছে। সমুদ্রের নিশ্বাসে নিশ্বাসে যাহা উচ্ছ্বসিত হইতেছে তাহার বাহিরে শব্দ, তাহার অন্তরে গান।

বাহিরের সঙ্গে ভিতরের একটা যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ অনুরূপতার যোগ নহে; বরঞ্চ দেখিতে পাই, সে যোগ সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের যোগ। দুই মিলিয়া আছে, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে মিল যে কোন্‌খানে তাহা ধরিবার জো নাই। তাহা অনির্বচনীয় মিল; তাহা প্রত্যক্ষ প্রামণযোগ্য মিল নহে। চোখে লাগিতেছে স্পন্দনের আঘাত, আর মনে দেখিতেছি আলো; দেহে ঠেকিতেছে বস্তু, আর চিত্তে জাগিতেছে সৌন্দর্য; বাহিরে ঘটিতেছে ঘটনা, আর অন্তরে ঢেউখেলাইয়া উঠিতেছে সুখদুঃখ। একটার আয়তন আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায়; আর-একটার আয়তন নাই, তাহা অখণ্ড। এই-যে "আমি' বলিতে যাহাকে বুঝি তাহা বাহিরের দিকে কত শব্দ গন্ধ স্পর্শ, কত মুহূর্তের চিন্তা ও অনুভূতি, অথচ এই-সমস্তেরই ভিতর দিয়া যে-একটি জিনিস আপন সমগ্রতায় প্রকাশ পাইতেছে তাহাই আমি এবং তাহা তাহার বাহিরের রূপের প্রতিরূপ মাত্র নহে, বরঞ্চ বাহিরের বৈপরীত্যের দ্বারাই সে ব্যক্ত হইতেছে।

বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্যই শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। এইজন্য তাঁহাদের সেই চেষ্টা অনুকরণের ভিতর দিয়া কখনোই সফল হইতে পারে না। অনেক সময়ে অভ্যাসের মোহে আমাদের বোধের মধ্যে জড়তা আসে। তখন, আমরা যাহকে দেখিতেছি কেমলমাত্র তাহাকেই দেখি। প্রত্যক্ষ রূপ যখন নিজেকেই চরম বলিয়া আমাদের কাছে আত্মপরিচয় দেয় তখন যদি সেই পরিচয়টাকেই মানিয়া লই তবে সেই জড় পরিচয়ে আমাদের চিত্ত জাগে না। তখন পৃথিবীতে আমরা চলি, ফিরি,কাজ করি, কিন্তু পৃথিবীকে আমরা চিত্ত দ্বারা গ্রহণ করি না। কারণ, এই পৃথিবীর অন্তরতর অপরূপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী। অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অপরূপতাকে উদ্‌ঘাটিত করিবার কাজেই কবিরা গুণীরা নিযুক্ত।

এইজন্য তাঁহারা আমাদের অভ্যস্ত রূপটির অনুসরণ না করিয়া তাহাকে খুব একটা নাড়া দিয়া দেন। তাঁহারা এক রূপকে আর-এক রূপের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার চরমতার

দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া দেন। চোখে দেখার সামগ্রীকে তাঁহারা কানে শোনার জায়গায় দাঁড় করান, কানে শোনার সামগ্রীকে তাঁহারা চোখে দেখার রেখার মধ্যে রূপান্তরিত করিয়া ধরেন। এমনি করিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন জগতে রূপ জিনিসটা ধ্রুব সত্য নহে, তাহা রূপকমাত্র; তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের মধ্যে পরিত্রাণ।

আমাদের গুণীরা ভৈরোঁতে টোড়িতে সুর বাঁধিয়া বলিলেন, ইহা সকালবেলাকার গান। কিন্তু, তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুমাত্র না। তবে ভৈরোঁকে টোড়িকে সকাল বেলার রাগিণী বলিবার কী মানে হইল। তাহার মানে এই, সকাল বেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সংগীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে এই সংগীতকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

আমাদের দেশের সংগীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন সায়াহ্ন অর্ধরাত্রি ও বর্ষাবসন্তের রাগিণী রচিত হইয়াছে। সে রাগিণীর সবগুলি সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কি না জানি না। অন্তত আমি সারঙ রাগকে মধ্যাহ্নকালের সুর বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। তা হউক, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবতখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে-একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইতেছে।

য়ুরোপের বড়ো বড়ো সংগীতরচয়িতারা নিশ্চয়ই কোনো- না- কোনো দিক দিয়া তাঁহাদের গানে বিশ্বের সেই অন্তরের বার্তাই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহাদের রচনার সঙ্গে যদি তেমন করিয়া পরিচয় হয় তবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। আপাতত য়ুরোপীয় সংগীতসভার বাহির-দেউড়িতে বাজে লোকের ভিড়ের মধ্যে যেটুকু শোনা যায় তাহার সম্বন্ধে দুই-একটা কথা আমার মনে উঠিয়াছে।

আমাদের জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় গান-বাজনা করিয়া থাকেন। যখনি সেরূপ বৈঠক বসে আমিও সেই ঘরের এক কোণে গিয়া বসি। বিলাতি গান আমার স্বভাবত ভালো লাগে বলিয়াই যে আমাকে টানিয়া আনে তাহা নহে। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, ভালো জিনিস ভালো লাগার একটা সাধনা আছে। বিনা সাধনায় যাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে তাহা অনেক সময়েই মোহ এবং যাহা নিরন্ত করে তাহাই যথার্থ উপাদেয়। সেইজন্য য়ুরোপীয় সংগীত আমি শুনিবার অভ্যাস করি। যখন আমার ভালো না লাগে তখনো তাহাকে অশ্রদ্ধা করিয়া চুকাইয়া দিই না।

এ জাহাজে একজন যুবক ও দুই-একজন মহিলা আছেন, তাঁহারা বোধ হয় মন্দ গান করেন না। দেখিতে পাই, শ্রোতারা তাঁহাদের গানে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। যেদিন সভা বিশেষ রূপে জমিয়া উঠে সেদিন একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি গান চলিতে থাকে। কোনো গান বা ইংলণ্ডের গৌরব গর্ব, কোনো গান বা হতাশ প্রণয়িনীর বিদায়সংগীত, কোন গান বা প্রেমিকের প্রেমনিবেদন। সবগুলির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আমি এই দেখি, গানের সুরে এবং গায়কের কণ্ঠে পদে পদে খুব একটা জোর দিবার চেষ্টা। সে জোর সংগীতের ভিতরকার শক্তি নহে, তাহা যেন বাহিরের দিক হইতে প্রয়াস। অর্থাৎ, হৃদয়াবেগের উত্থানপতনকে সুরের ও কণ্ঠস্বরের ঝোঁক দিয়া খুব করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া দিবার চেষ্টা। ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের হৃদয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের কণ্ঠস্বরের বেগ কখনো মৃদু কখনো প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু, গান তো স্বভাবের নকল নহে; কেননা, গান আর অভিনয় তো এক জিনিস নয়। অভিনয়কে যদি গানের সঙ্গে মিলিত করি তবে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। তাই জাহাজের সেলুনে বসিয়া যখন ইহাদের গান শুনি তখন আমার কেবলই মনে হইতে থাকে, হৃদয়ের ভাবটাকে ইহারা যেন ঠেলা দিয়া, চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে চায়।

কিন্তু, সংগীতে তো আমরা তেমন করিয়া বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই না প্রেমিক ঠিকটি কেমন করিয়া অনুভব করিতেছে তাহা তো আমার জানিবার বিষয় নহে। সেই অনুভূতির অন্তরে অন্তরে যে-সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই। বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে এই অন্তরের প্রকাশ একেবারে ভিন্নজাতীয়। কারণ, বাহিরের

দিকে যাহা আবেগ, অন্তরের দিকে তাহা সৌন্দর্য। ঈথরের স্পন্দন ও আলোকের প্রকাশ যেমন স্বতন্ত্র, ইহাও তেমনি স্বতন্ত্র।

আমরা অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাঁদি ও হাস্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু, দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের ও সুখের গানে হাস্যধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তাহাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নাই। বস্তুত যেখানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি ঝরিয়া পড়ে না এবং হাস্যের ভিতরকার হাস্যটি ধ্বনিয়া উঠে না, সেইখানেই সংগীতের প্রভাব। সেইখানে মানুষের হাসিকান্নার ভিতর দিয়া এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয় যেখানে আমাদের সুখদুঃখের সুরে সমস্ত গাছপালা নদী নির্ঝরের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয়সমুদ্রেরই লীলা বলিয়া বুঝিতে পারি।

কিন্তু, সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক দিয়া হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতো সংগীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস; কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নহে।

অভিনয়-জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু, এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের হ্যাম্‌লেট ও ব্রাইড অফ লামার্মূর দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া

ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।

আর্ট-জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি । কারণ, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। মানবজীবনের সাধনাতেও যাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান তাঁহারাও বাহ্য উপকরণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সংযমকে আশ্রয় করেন। এইজন্য আত্মার সাধানায় এমন একটি অদ্ভুত কথা বলা হইয়াছে: "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। আর্টেরও চরম সাধনা ভূমার সাধনা। এইজন্য প্রবল আঘাতের দ্বার হৃদয়কে মাদকতার দোলা দেওয়া আর্টের সত্য ব্যবসায় নহে। সংযমের দ্বারা তাহা আমাদিগকে অন্তরের গভীরতার মধ্যে লইয়া যাইবে, এই তাহার সত্য লক্ষ্য। যাহা চোখে দেখিতেছি তাহাকেই নকল করিবে না, কিম্বা তাহারই উপর খুব মোটা তুলির দাগা বুলাইয়া তাহাকেই অতিশয় করিয়া তুলিয়া আমাদিগকে ছেলে-ভুলাইবে না।

এই প্রবলতার ঝোঁক দিয়া আমাদের মনকে কেবলই ধাক্কা মারিবার চেষ্টা য়ুরোপীয় আর্টের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর য়ুরোপ বাস্তবকে ঠিক বাস্তবের মতো করিয়া দেখিতে চায়। এইজন্য যেখানে ভক্তির ছবি আঁকা দেখি সেখানে দেখিতে পাই, হাত দুখানি জোড় করিয়া মাথা আকাশে তুলিয়া চোখের তারা দুটি উল্‌টাইয়া ভক্তির বাহ্য ভঙ্গিমা নিরতিশয় পরিস্ফুট করিয়া আঁকা। আমাদের দেশে সে-সকল ছাত্র বিলাতি আর্টের নকল করিতে যায় তাহারা এইপ্রকার ভঙ্গিমার পন্থায় ছুটিয়াছে। তাহারা মনে করে, বাস্তবের উপর জোরের সঙ্গে ঝোঁক দিলেই যেন আর্টের কাজে সুসিদ্ধ হয়। এইজন্য নারদকে আঁকিতে গেলে তাহারা যাত্রার দলের নারদকে আঁকিয়া বসে–কারণ, ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখা তো তাহাদের সাধনা নহে; যাত্রার দলে ছাড়া আর তো কোথাও তাহারা নারদকে দেখে নাই।

আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে একদা গ্রীকশিল্পীরা তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল। তাহা উপাবাসজীর্ণ কৃশ শরীরের যথাযথ প্রতিরূপ; তাহাতে পাঁজরের প্রত্যেক হাড়টির হিসাব গণিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় শিল্পীও তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপবাসের বাস্তব ইতিহাস নাই– তাপসের আন্তর মূর্তির মধ্যে হাড়গোড়ের হিসাব নাই; তাহা ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইবার জন্য নহে। তাহা বাস্তবকে কিছুমাত্র আমল দেয় নাই

বলিয়াই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। ব্যবসায়ী আর্টিস্ট্ বাস্তবের সাক্ষী, আর গুণী আর্টিস্ট সত্যের সাক্ষী। বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখি আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাত্ম্যকে খর্ব করিতেই হইবে; বাহিরের রূপটাকে সাহসে সঙ্গে বলিতেই হইবে, "তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষমাত্র।'

১৪.৮। অনুশীলনী

১। মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ভাবনার পরিচয় দিন।

২। মানুষের ধর্ম-১ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা ব্যক্ত করুন।

৪। 'জীবভাব' অতিক্রম করে মানবাত্মা 'বিশ্বভাবে' কেমন করে উত্তীর্ণ হয়, মানুষের ধর্ম অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৫। মানুষের ধর্ম প্রবন্ধ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতার পরিচয় দিন।

১৪.৯। গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রদর্শন – ড. হিরন্ময় বন্দযোপাধ্যায়।

২। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : ধর্ম ও দর্শনচিন্তা – ড. সতেন্দ্রনাথ রায়।

৩। রবীন্দ্রচেতনায় মানবধর্ম – ড. তুষারকণা রায়।

৪। রবীন্দ্রকাব্যে নিসর্গ প্রকৃতি – ড. নন্দদুলাল বণিক।

৫। আত্মচরিতের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য – ড. নন্দদুলাল বণিক।

৬| কবীর ও রবীন্দ্রনাথ : চেতনার অন্তলোক - ড. নন্দদুলাল বণিক।